ঋগ্বেদ-সংহিতা

বৃহচ্চেতনায় গায়ত্রী ও অগ্নিমন্ত্রে মহাবিশ্ব

শ্রীঅনির্বাণ

ঋ গ্বে দ - সং হি তা

বৃহচ্চেতনায় গায়ত্রী ও
অগ্নিমন্ত্রে মহাবিশ্ব



শ্রীঅনির্বাণ
(১৮৯৬-১৯৭৮)

ঋগ্বেদ-সংহিতা

বৃহচ্চেতনায় গায়ত্রী ও অগ্নিমন্ত্রে মহাবিশ্ব

শ্রীঅনির্বাণ

হৈমবতী-অনির্বাণ বেদ বিদ্যালয় ট্রাস্ট
কলকাতা

Rig-Veda Samhita
Brihachchetanay Gayatri O
Agnimantre Mahavishva

প্রথম প্রকাশ: ৯ জুলাই ২০০৪

সংকলন ও সম্পাদনা:
রমা চৌধুরী, দীনেন্দ্র মারিক, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও
প্রবোধ চন্দ্র রায়

প্রকাশক:
প্রবোধ চন্দ্র রায়
হৈমবতী-অনির্বাণ বেদ বিদ্যালয় ট্রাস্ট
১/১এ রমণী চ্যাটার্জী রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯

অনুদান: পঁচিশ টাকা মাত্র

অক্ষর বিন্যাস: নন্দন ফটোটাইপ
২৯ জাস্টিস এম. এম. মুখার্জী রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রণ: গিরি প্রিন্ট সার্ভিস
৯১-এ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

পূর্বকথা

ঋগ্বেদ-সংহিতা বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ। এই গ্রন্থের পঠন-পাঠন চার হাজার বছর আগে লুপ্ত হলেও তার একটি ধারা ফল্গু নদীর মত গুপ্তভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। বেদচর্চা তেমনভাবে না হলেও বেদমন্ত্র পাঠ অব্যাহত থাকে। অথচ মন্ত্রের অর্থ থাকে উপেক্ষিত। বেদমন্ত্রের যে একটা অর্থ আছে সেটি সর্বপ্রথম মেলে ধরেন মহামুনি যাস্ক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে। তারপর চতুর্দশ শতাব্দীতে মহামতি সায়ণাচার্য বেদের কর্মপর ব্যাখ্যা করেন। বিংশ শতাব্দীতে মহাতপা বেদভাষ্যকার শ্রীঅনির্বাণ সর্বপ্রথম সংহিতার রহস্যব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে তিনি হিমালয়ের আলমোড়ায় লোহাঘাটে এক নির্জন পরিবেশে ঋষি বিশ্বামিত্রের চিত্তে উদ্ভাসিত মন্ত্রগুলির টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ রচনা করেন।

বেদমন্ত্রের রহস্য-অর্থ বোঝার জন্য প্রয়োজন এক অখণ্ড ভাবনা। ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোয় বিশ্লেষণ করলে তবেই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রকাশ পায়। আর তখনই জানা যায়, এই মহাবিশ্ব এক বিদ্যুৎ-প্রভাবিত ক্ষেত্র এবং এর প্রতি অনুপরমাণুতে বিদ্যুতের সমাবেশ, বিদ্যুতের সমাহার। সংহিতার দশম মণ্ডলে ৪৫শ সূক্তে বস্তুর মধ্যে বিদ্যুৎ অবস্থানের উল্লেখ আছে। ওই মণ্ডলেরই ৭২শ সূক্তে বলা হয়েছে যে অবিদ্যমান হতে বিদ্যমান বস্তু এবং পরে জ্যামিতিক ক্ষেত্র ‘উত্তান পদ’ হতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে। ১২৯শ সূক্তে দেখা যায়, সময় ও পরিসরের পূর্বে এক আঁধার আঁধারকে ঢেকে রেখেছিল। এই যে আঁধার তা মাতৃকা বা আদ্যাশক্তি রূপে মহাবিশ্ব প্রকাশের পূর্ব হতে বিরাজ করছিল। আর এই আধার শক্তি উৎপন্ন হয়েছে বস্তুর বিকীর্ণরূপ থেকে। মহাবিশ্ব বস্তুতপক্ষে এক যুগল-বিদ্যুৎ-প্রভাবিত ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্র থেকে দুটি ধারা প্রবহমান—ধনাত্মক ও ঋণাত্মক। ধনাত্মক ক্ষেত্র হতে বস্তুর উৎপত্তি, আর ঋণাত্মক ক্ষেত্রটি বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধক অর্থাৎ স্থির বিদ্যুৎরূপে বস্তুকে নিজ ক্ষেত্রের দিকে অহরহ আকর্ষণ করে চলেছে। এই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ধারণাগুলি জ্যামিতিক গুণের পরিকাঠামোয় ‘উত্তান পদে’ ব্যক্ত হয়েছে।

ঋগ্বেদ-সংহিতায় ১০,৪৭২টি ঋকের মধ্য থেকে এই পুস্তিকায় প্রথম পর্যায়ে মহাবিশ্ব প্রকাশ সম্পর্কীয় ন'টি ঋক, দ্বিতীয় পর্যায়ে বৃহৎচেতনা সম্বন্ধীয় তেরোটি ঋক্ ও তৃতীয় পর্যায়ে কয়েকটি ঋকে প্রাচীন ভারতের বৈদিক ঋষির বহির্ভারত গমনের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। ওই যাত্রার প্রাক্কালে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা-ভাবনার যে শীর্ষরূপটি ফুটে উঠেছিল সেটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস ছাড়া আমার আর কোন অভীপ্সা নেই।

ভারতীয় চিন্তাভাবনার শীর্ষরূপ বলতে বোঝায় বোধি বা ধীশক্তির সন্ধান। এই ধীশক্তি একটি প্রাকৃতিক গুণ-সম্পদ যা বিগলিত ধারায় নেমে আসে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় বোধি উন্মেষণে ঋষির এই প্রার্থনা মূর্ত হয়েছে গায়ত্রীমন্ত্রে। সংহিতার সকল মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্র এখনও দীপ্যমান। এবং এইটি যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠমন্ত্র তা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। ভারতের অর্জিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার রূপরেখা কিছুটা তুলে ধরার প্রয়াস ছাড়া বেদ বিদ্যালয়ের পক্ষে আর কোন অভিপ্রায় নেই।

৯ জুলাই ২০০৪
১/১এ রমণী চ্যাটার্জী রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯

রমা চৌধুরী
অধ্যক্ষা
হৈমবতী-অনির্বাণ বেদ বিদ্যালয়

১

শ্রীঅনির্বাণ

(সংক্ষিপ্ত জীবনী)

মরমীয়া কবি, বাউল। আনন্দে বিহ্বল, অধ্যাত্মচেতনার আবেশে কবিত্বের ছটায় বেদভাষ্যের প্রকাশ। জন্ম মৈমনসিংহে, ৮ জুলাই ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে। পূর্বনাম নরেন্দ্র চন্দ্র ধর, পিতা রাজচন্দ্র ও মাতা সুশীলা দেবী। ঢাকা ও কলকাতায় কঠোর ছাত্রজীবন যাপন করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করে পিতা ও মাতার মতো শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সনে ব্রহ্মচর্য ও ১৯২৭ সনে সন্ন্যাস। নাম হয় স্বামী নির্বাণানন্দ সরস্বতী। আসামের কোকিলামুখে 'আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠে' দীর্ঘ বারো বছর পরিচালক, ঋষি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরে আচার্য এবং 'আর্য্যদর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩০ সন থেকে বাউল পরিব্রাজক রূপে হিমালয়ের গভীরে নিভৃতে সাধনা করেন। এখানে বালক বয়সে দেখা মাতা হৈমবতী বা বেদমাতা বাকের পূর্ণ উদ্ভাস লাভ করে বেদ-সংহিতাকে সমগ্র ভারতীয় সাধনা, দর্শন ও সংস্কৃতির মূলাধার রূপে উপলব্ধি করেন। তাঁর বেদভাষ্য রচনা আলমোড়ায় ১৯৫১ থেকে ১৯৫৮ অবধি। আর তাঁর বাকি জীবন এই সত্যদর্শনেরই বিবৃতি। এই মহাসমন্বয়ের উপলব্ধিকে বিস্ময়কর বৈদগ্ধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে মণ্ডিত করে তিনি রচনা করেন মহাগ্রন্থ 'বেদ-মীমাংসা'।

১৯৭৮ সনে ৩১মে তিনি প্রয়াত হন।

২
বৈদিক সাহিত্য প্রসঙ্গে শ্রীঅনির্বাণ

ভারতবর্ষের ইতিহাসের উষাকাল শুরু হয়েছে বৈদিক যুগ দিয়ে। তার আগের কথা আমাদের ভাল করে জানা নাই। এর চাইতেও প্রাচীন কোনও বিশিষ্ট সংস্কৃতি যদি এদেশে থেকেও থাকে, তা বৈদিক সংস্কৃতির মাঝে জীর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং বলা যেতে পারে, বেদের মাঝেই ভারতবর্ষ যেন সর্বপ্রথম সমগ্রভাবে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। আর এই আত্মসচেতনতা রূপ নিয়েছে অধ্যাত্মভাবনায়...।

সাহিত্যে পাই জাতির অন্তরের ইতিহাস, তার যথার্থ আত্মপরিচয়। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাসকে বোঝবার পক্ষে বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা এবং তার ভাবনার অনুশীলন তাই অপরিহার্য।

এই সাহিত্যের আয়তন অতি বৃহৎ। একটা জাতির বহু সহস্রব্যাপী অধ্যাত্মচিন্তার ধারাকে এর মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। আজও যে সে-চেষ্টার বিরাম হয়েছে, এ কথা বলা চলে না...।

...এইজন্য বেদমন্ত্রকে বুঝতে হলে অতীতের কুহেলিকাচ্ছন্ন স্বল্পালোকের মধ্যে চোখ বুজে কেবল হাতড়ে বেড়ালেই চলবে না। তার জন্য বুঝতে হবে ভারতবর্ষের অনতিবিস্মৃত অতীতকে এবং বর্তমানকেও। কেননা এই মন্ত্রের মূলে যে-প্রবেগ একটা জাতির ঊষাকালে তার গভীরতম আকূতি হতে উৎসারিত হয়েছিল, তা আজও স্তিমিত হয়ে যায়নি এবং তার এমন-একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা কালপ্রবাহের মধ্যেও নিজের অনন্যত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বৈদিক যুগকে বুঝতে হলে, ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসকে তলিয়ে বুঝতে হবে তার বর্তমান যুগ পর্যন্ত।

৩
ঋগ্বেদ-সংহিতায় মহাবিশ্ব

ঋগ্বেদ-সংহিতা অনন্তপ্রয়াসী এক মন্ত্র-সংগীতমালা। অগ্নিমন্ত্র এই বিস্তীর্ণ সংগীতমালার অন্যতম মন্ত্র। অগ্নিমন্ত্রে পূর্বতন ঋষিরা চুপিচুপি কথা কন, নিভৃতে বলেন, আর কেউ কেউ উৎকর্ণ হয়ে শোনেন সেই সব কথা, নিজ নিজ কথা, আপনআপন অন্তরের কথা, অস্তিত্বের কথা, মহাবিশ্ব ও পরম সত্যের কথা। সেই সত্য ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি স্পন্দিত হয়ে মিশে যায় তারামণ্ডলে, থেকে যায় কিছু অনুরণন "পূর্বগৃহে"। কালের আবর্তনে তারা উদ্‌ভাসিত হয় ঋষির চিত্তে। ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষির চিত্তে প্রতিভাত হয়েছিল এই অগ্নিমন্ত্র।

অগ্নিমীলে. পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্।।১
অগ্নিঃ পূর্বেভিঃ ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরূত। স দেবাঁ এহ বক্ষতি।।২

ঋ. স. ১।১।১,২

তপস্যার মাঝে আমি তপের দেবতাকে জাগিয়ে তুলি
সেই দেবতা হন আমার দিশারী
উৎসর্গ ভাবনার দীপ্তপ্রকাশে নেমে আসেন ঋতদীপ্তি
আমার ভাগ্যবিধাতা।১
এই দেবতা পূর্বতন ঋষিদের তপস্যায়
পূর্বেও প্রজ্জ্বলিত হয়েছেন এবং
নতুনকবির তপস্যায় পুনর্বার প্রজ্জ্বলিত হবেন।
তিনি যে বিশ্বদেবতাকে এখানে নিয়ে আসবেন।২

এই মন্ত্র নিরবধি কাল ধরে প্রবহমান যা সৌন্দর্য, সামঞ্জস্যে ঋদ্ধ, এ-সেই চৈতন্যময় সত্তা যা মহাবিশ্বের সকলকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। বৈদিক ঋষি

ঋতদীপ্তির মূল অগ্নিকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বন্দনা করেছেন। পূর্ব-পূর্ব ঋষি জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে, ভূলোকে, দ্যুলোকে সর্বত্র অগ্নির প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন তাই বৎসপ্রি ঋষি অগ্নির স্তুতি করছেন।

দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিরস্মদ্দ্বিতীয়ং পরি জাতবেদাঃ।
তৃতীয়মপ্সু নৃমণা অজস্রমিন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ।।১
বিদ্মা তে অগ্নে ত্রেধা ত্রয়াণি বিদ্মা তে ধাম বিভৃতা পুরুত্রা।
বিদ্মা তে নাম পরমং গুহা যদ্বিদ্মা তমুৎসং যত আজগন্থ।।২
সমুদ্রে ত্বা নৃমণা অপ্স্বন্তর্নৃচক্ষা ঈধে দিবো অগ্ন ঊধন্।
তৃতীয়ে ত্বা রজসি তস্থিবাংসমপামুপস্থে মহিষা অবর্ধন্।।৩

ঋ. স. ১০।৪৫।১,২,৩

অগ্নি প্রথম আকাশে বিদ্যুৎরূপে জন্মান, তাঁর দ্বিতীয় জন্ম হয় চেতনার আবেশে জাতবেদারূপে, আর তৃতীয় জন্ম জলে; এভাবে তিনি জগদ্ধিতায় বিরাজ করছেন। এ তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি তাঁর স্তুতি করেন। ঋষি বলেন, হে অগ্নি, আমরা তোমার তিনটি রূপের কথা জানি। তুমি যেখান থেকে এসেছো তাও আমরা জানি। তুমি সমুদ্রের অভ্যন্তরে, আকাশে আদিত্যরূপে, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎরূপে; সর্বত্রই তোমার অধিষ্ঠান।

ঋ. স. ১০।৪৫।১,২,৩

অগ্নি মহাবিশ্ব সৃষ্টির মূল। আবার অন্যভাবে বলা যায়, মহাশূন্যতাই মহাবিশ্বের মূল। আকাশ ও অবকাশে সৃষ্ট মহাকাশের নিভৃত কন্দরে পুষ্ট, এক অপ্রকাশিত বিমূর্ত সত্তায় তিনি অন্তর্লীন। মহাবিশ্বে তখন সময় ও পরিসর ছিল না। প্রজাপতি ঋষির নাসদীয় সূক্তে পাই।

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্।১
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস।২

ঋ. স. ১০।১২৯।১,২....৭

তখন অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কোনও কিছু ছিল না।
মৃত্যু বা অমৃতচেতনা সেখানে কোনও দিন ছিল না।
কেবল এক আঁধার আঁধারকে গাঢ়তায় ঢেকে রেখেছিল।
সেথায় না ছিল দিন বা রাত্রির আনাগোনা।
অথবা প্রাণাপানের চিহ্ন ও নক্ষত্রমালা।
কিন্তু এক "ইচ্ছা" দানা বেঁধেছিল, সেটি কার কে জানে।।

ঋ. স. ১০।১২৯।১,২...৭

সেই নৈঃশব্দ্য, অস্পন্দ, স্থাণুবৎশৈলতে সহসা স্পন্দন দেখা দিল। অমূর্ত সত্তাটি এক লহমায় মূর্ত হয়ে চকিত আলোয় ঝলমলিয়ে মহাকাশ ভরিয়ে তুলল। যিনি মূর্ত হলেন তিনি অগ্নি। বিদ্যুৎরূপে প্রকাশ পেলেন। বস্তুত এই মহাবিশ্ব এক বিদ্যুৎ-প্রভাবিত ক্ষেত্র, দুই প্রবাহধারায় প্রবহমান। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক। ধনাত্মক ক্ষেত্রটি যেমন বস্তু গঠন করে, এই ক্ষেত্র তেমন বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধ করায় সংকর্ষণ শক্তির উদ্ভব হয়। এই শক্তিক্ষেত্রের প্রভাবে ধনাত্মক বস্তুর বিকীর্ণ শক্তি ওই ক্ষেত্রেরই সংস্পর্শে আসায় অগ্নির প্রজ্জ্বলন ঘটে।

হোতাজনিষ্ট চেতনঃ পিতা পিতৃভ্য ঊতয়ে...।।

ঋ. স. ২।৫।১

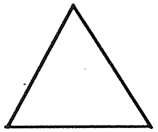
মহাবিশ্বের মূল বস্তু অগ্নি পিতৃদের রক্ষার জন্য "পূর্বগৃহ" থেকে আবির্ভূত হন। তিনি চৈতন্যস্বরূপ, পিতৃস্বরূপ, পিতৃদের স্মরণার্থে এলেন। হোতা তিনি, মহাকাশে যেখানে অপ্রকাশিত সত্তা "অসৎ" ও প্রকাশিত সত্তা "সৎ" এর মিলনক্ষেত্র সেখানে তিনি প্রকাশিত হলেন।

দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্।
উত্তানয়োশ্চম্বো র্যোনিরন্তরত্রা পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ।।

ঋ. স. ১।১৬৪।৩৩

ঋষি দীর্ঘতমার চিত্তে উদ্ভাসিত মন্ত্রে "উত্তান পদ" এক পারিভাষিক সংজ্ঞা,

ত্রিভুজাকৃতি এর দুই পদ বা ঊর্দ্ধমুখীন বাহু যখন এক বিন্দুতে মিলিত হয়ে এক অধস্ত্রিকোণের সৃষ্টি করে তখন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হন।



উত্তান পদ

এই দুই ঊর্দ্ধ বাহুর একটি বস্তুর বিকীর্ণ শক্তি, বা উচ্ছিষ্ট তেজ। এটি যখন স্থির বিন্দু ঋণাত্মক ক্ষেত্রের সংস্পর্শে আসে তখন দুয়ের সংযোগে অগ্নির প্রজ্জ্বলন। অগ্নির পর আবিভূর্ত হন ইন্দ্র,—বজ্র ও বিদ্যুতের দেবতা। তাঁর ছটায় মেঘলোকে বিদ্যুৎ সঞ্চারণের প্রভাবে অবরুদ্ধ জলের প্রকাশ।

ইন্দ্রো মহাং সিন্ধুমাশয়ানং মায়াবিনং বৃত্রমস্ফুরন্নিঃ।
অরেজেতাং রোদসী ভিয়ানে কনিক্রদতো বৃষ্ণো অস্য বজ্রাৎ।।

ঋ. স. ২।১১।৯

হে মহীয়ান ইন্দ্র, তুমি মেঘমালায় ভেসে বেড়ানো মায়াবী বৃত্রকে বধ করেছ। তোমার বজ্রের স্তনিত শব্দে অন্তরিক্ষ কেঁপে উঠল আর তাতেই অবরুদ্ধ জলের ধারা নেমে এল।

অগ্নি ও ইন্দ্রের পর এলেন সোম ও সোমলতা।

ঋতুর্জনিত্রী তস্যা অপস্পরি মক্ষূজাত আবিশদ্ যাসুবর্ধতে।
তদাহনা অভবৎ পিপ্যুষী পয়োহংশোঃ পীযূষং প্রথমং তদুকথ্যম্।।

ঋ. স. ২।১৩।১

সোম, বর্ষা ঋতু তার জননী, জন্মমাত্র জলের সহচর ও প্রাণের ধারক, কিন্তু পরোক্ষ অর্থে শুদ্ধ-সত্ত্ব-চেতনা। আর চেতনার জাগরণে বাকের আবির্ভাব। সোমলতা, অনুমান করা যায় এটি শিলাজিৎ। পাহাড়ের গা বেয়ে লতার মত নেমে আসা শিলীভূত ঘাম, দু-হাতের আঙ্গুলে দিয়ে সংগ্রহ করতে হয় এবং মেষলোমের ছাঁকনীতে ছেঁকে পান করা হয়, যা এক বলকারী পানীয়।

অগ্নি, ইন্দ্র ও সোম এই তিনজন, ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রধান তিন দেবতা। এ-ছাড়া আছেন স্কন্ত ও রুদ্র সংকর্ষণ ও বিনাশের দেবতা। অগ্নি মহাবিশ্বের মূল, ইন্দ্র বিদ্যুৎ সৃজন করেন ও সোম চেতনা জাগিয়ে তোলেন।

ন বি জানামি যদিবেদমস্মি নিণ্যঃ সংনদ্ধো মনসা চরামি।
যদা মাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ।

ঋ. স. ১।১৬৪।৩৭

আমি কি তা জানি না, কেননা আমি মূঢ়চিত্ত। জ্ঞানের উন্মেষ যখন হয় তখনই বাকের অর্থ বুঝতে পারি। বাক্ প্রথমে পরমব্যোমে সংবৃত ছিল।

ইমা অস্মৈ মতয়ো বাচো অস্মদাঁ ঋচো গিরঃ সুষ্টুতয়ঃ সমগ্মত

ঋ. স. ১০।৯১।১২

মন আগুনের শিখার মত যখন দ্যুলোকের পানে ছুটে চলে তখনই মন্ত্রের উদ্ভাস ঘটে।

ঋষি সোমদেবতাকে আহ্বান করেন।

স পবস্ব বিচর্ষণ আ মহী রোদসী পৃণ। উষাঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ।

ঋ. স. ৯।৪১।৫

সূর্য যেমন রশ্মিদ্বারা সকলকে পূর্ণ করেন, হে সর্বদর্শী সোম, তুমি তেমন আপন মহিমায় ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ পূর্ণ কর। ঋষি সোমচেতনায় আবিষ্ট হয়ে সত্যের অভিমুখে চলেছেন। পলকে-পলকে পূর্বকালীন ঋষির চিত্তে উপলব্ধ মন্ত্রগুলি পুনর্বার তাঁদের চিত্তে উদ্ভাসিত হতে থাকে, অর্থাৎ সোমচেতনা হতে যেমন বাক্, আবার বাক্ হতে তেমন মন্ত্র, যা এক অবিনাশী সত্তা,—বাকরূপী ব্রহ্মণ্। এই রকম এক মন্ত্রের দিব্যউদ্ভাস বৈদিকযুগের শীর্ষসময়ে লাভ হয়েছিল। মন্ত্রটি ঋষি বিশ্বামিত্রের চিত্তে উদ্ভাসিত হয়,

সংহিতার সকল মন্ত্রের মধ্যে এই মন্ত্রটি গায়ত্রীমন্ত্ররূপে ভারতজনের কাছে আজও সজীব হয়ে আছে, বাকি সব বিশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজা সুদাসের যজ্ঞসভায় ঋষি বিশ্বামিত্র কী ভেবে এই ঋক্‌টি উচ্চারণ করেছিলেন তা জানা নেই, তবে তাঁর সেদিনকার বাণী আজও সত্য হয়ে আছে। ওই ব্রাহ্মীচেতনা ভারতজনকে আজও রক্ষা করে আসছে। মন্ত্রটি বোধি বা ধীশক্তি উদ্বোধক। ঋষি স্তব করছেন, মাথার উপর অনন্ত আকাশ আর নিচে বিপুলা পৃথ্বি—দুয়ের মাঝে জ্বলছেন ইন্দ্র আদিত্যরূপে। তাই তাঁর প্রার্থনা, এই বলয়ে সূর্যের যে শক্তি মানুষকে প্রেরণা দান করে আমরা সেই তেজ ধ্যান করি। সূর্য যেন আমাদের ধীশক্তি দেন, তিনি যেন তাঁর বরণীয় জ্যোতি আমাদের হৃদয়ে বিস্তার করেন, তিনি যেন দিব্যজ্যোতির উদ্ভাস প্রদান করেন। এই মন্ত্র উদ্‌ভাসনের পর বৈদিকসভ্যতা অস্তমিত হয়। এই সভ্যতা রেখে গেছে এক বোধ যা মানুষের কাছে এক পরম সম্পদ, এই হার্দিক সম্পদ প্রকৃতির অকৃপণ-দানে বিগলিত ধারায় নেমে আসে এই পৃথিবীতে।

বৈদিকসভ্যতার অনতিকাল পূর্বে আর এক সমান্তরাল সভ্যতা প্রবহমান ছিল। তখনও ভাষার আবির্ভাব ঘটেনি, ভাবের বিনিময় ঘটত চিত্র বা চিত্রলিপিতে। কখনওসখনও ভাবের সংবেগে যে দু'একটি বাকের আবির্ভাব হ'ত তার বিস্তারকে বলা হত তন্, এই তন্ থেকে তন্ত্র। প্রাচীন মানুষের মনে ভাবের প্রসারণে প্রথম চৈতন্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় এক দেবীমূর্তির পরিকল্পনায়। দেবী তাঁর চার প্রসারিত বাহু নিয়ে এক পুরুষ মূর্তির উপর দাঁড়িয়ে আছেন। চারটি বাহু চারটি প্রাকৃতিক শক্তির প্রকাশ—সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ও মাতৃকা বা আদ্যাশক্তি। এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে ধারণ করছেন ওই পুরুষ মূর্তি। এই পাঁচটি শক্তি নিয়েই মহাবিশ্বের যা-কিছু রহস্য। এই যুগলমূর্তি মহাবিশ্বের সকল রহস্যকে মূর্ত করছে দুটি ক্ষেত্রের ধারণায় এবং এই দুই ক্ষেত্রের সমন্বয়ে ব্যক্ত হচ্ছে মহাবিশ্ব, একটি ক্ষেত্র বস্তুর উপাদান, অন্যটিতে বস্তুর গঠন প্রক্রিয়ার বিন্যাস সাধন হচ্ছে। প্রাক্‌বৈদিক সভ্যতার তন্ত্র ও বৈদিক কালের মন্ত্র এই দুই ধারার শীর্ষরূপ প্রকাশ পেয়েছে জ্যামিতিক গুণে বা যন্ত্রে যা হল এক ত্রিভুজ, এর দুই বাহু যেখানে মিলিত হয়ে এক অধস্ত্রিকোণের সৃষ্টি করে সেখানে অগ্নির প্রজ্বলন ও মহাবিশ্বের সূচনা রচিত হয়।

বৈদিক সভ্যতার শীর্ষকালে রাজা সুদাস এক যজ্ঞসভার আয়োজন করেন সেই যজ্ঞে ঋষি বিশ্বামিত্র পৌরোহিত্য করেন যদিও বসিষ্ঠমুনি রাজার কুলপুরোহিত ছিলেন। যজ্ঞ সমাপ্তির পর রাজা প্রচুর দক্ষিণা দেন, ঋষি বিশ্বামিত্র সেই দাক্ষিণ্যে তাঁর কুশিক অনুচর ও দশ রাজন্যকে সঙ্গে নিয়ে বহির্ভারত যাত্রা করেন। ঋগ্বেদ-সংহিতায় তৃতীয় মণ্ডলে ৩৩ শ সূক্তে এই যাত্রার এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে। ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বিপাশা ও শতদ্রুর সামনে এসে পৌঁছলেন। চেয়ে দেখেন বিপাট্ ও ছুতুদ্রী অফুরন্ত জলরাশি নিয়ে পাহাড় থেকে প্রচন্ড বেগে সগর্জনে নেমে আসছে। এই নদী যুগল শ্বেত অশ্বের মত ছুটে চলেছে সঙ্গমের দিকে, তারপর একীভূত হচ্ছে। ঋষি সেখানে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টি ও মনে বলছেন:

প্র পর্বতানামুশতী উপস্থাদশ্বে ইব বিষিতে হাসমানে
গাবেব শুভ্রে মাতরা রিহাণে বিপাট্ ছুতুদ্রী পয়সা জবেতে।।

ঋ. স. ৩।৩৩।১

এই লৌকিক কবিতাটি মনে এক বিস্ময়-মুগ্ধতার ছাপ রেখে যায়। ঋষির এই অভিযান সম্ভবত মিশর ও পারস্য পর্যন্ত বিস্তারিত হয়েছিল। অভিযান অন্তে ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাজা সুদাসের এক সংঘর্ষ ঘটে। রাজার পক্ষে ছিলেন মুনি বসিষ্ঠ ও ঋষির পক্ষে তাঁর অনুচর ও দশ রাজন্য। এই যুদ্ধ দশরাজন্যের যুদ্ধ। এই বিধ্বংসী যুদ্ধে সিন্ধুনদের তীরবর্তী তন্ত্র ও মন্ত্র খ্যাত দুই বিশাল জনপদ, হরপ্পা ও মহেঞ্জদারো নগর সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক আধিকারিক মর্টিমার হুইলারের মতে নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে যে-সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা খ্রিস্টপূর্ব দু'হাজার বছরের অধিক প্রাচীন। নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি পুরুষের উত্তমাংশ ও একটি পূর্ণাবয়ব নারীমূর্তি আছে যা শিব ও শক্তি বা তন্ত্রধারার প্রতীক বলে পরিগণিত হয়। অনুমান করা যায়, ঋষি বিশ্বামিত্রের উদ্‌ভাসন গায়ত্রীমন্ত্র ও মুনি বসিষ্ঠের প্রণবমন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে সম্ভবত এই বিরোধের সূচনা হয়।

বৈদিক সভ্যতার অবসানে বেদ-চর্চা প্রায় লুপ্ত হয়, তবে তার একটি ধারা ফল্গুনদীর মতো গুপ্তভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। হরপ্পা-মহেঞ্জদারো যুদ্ধের

প্রাক্কালে যারা বহির্ভারতে গিয়েছিলেন তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যগণ শিকড়ের সন্ধানে যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, তাঁদের সেই প্রত্যাবর্তনকে আর্যজাতির ভারত আক্রমণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত তাঁদের আগমনে ভারতে নতুন বেদ ভাবনার যে প্রসার ঘটে অর্থাৎ বেদ-মন্ত্রের নতুন চিন্তনের ধারাগুলিই উপনিষদ্ রূপে পরিবেশিত হয়েছে। বেদ-চর্চার অবসানে বেদের অর্থলুপ্তি ঘটে যদিও বেদপাঠ ও বেদমন্ত্র এখনও মঠ ও মন্দিরে নিত্য উচ্চারিত হয়ে চলেছে প্রকৃত অর্থ না জানা সত্ত্বেও। বেদের যে অন্তর্নিহিত ভাবনা তা চেতনা ও মানবিক বোধের উদ্বোধক। মানুষের যে দুটি প্রধান প্রাকৃতিক গুণ-সম্পদ—বুদ্ধি ও মানবীয় বোধ, এ-দুয়ের সমতা ও সামঞ্জস্য চেতনা-উদ্দীপনের সহায়ক। এই যে অস্তিত্ব, তার যেমন অভ্যুদয় আছে তেমন লয়ও থাকবে, এই বোধও চেতনা-উদ্দীপনের সহায়ক। সমগ্র বেদ মন্ত্রে এক ভাবনা, এক সাধনা, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ঋষি একই বার্তা নানাভাবে শুনিয়েছেন; আদ্যন্ত একই স্বরে; আমাদের চেতনার জাগরণ ঘটুক। ঋক্ অর্থ আকৃতির মন্ত্র, সেখানে কেবল আকৃতির কথা, হৃদয় নিঙ্‌ড়ানোর কথা, সোমপানের কথা। সোমচেতনা ঘটলে যে হার্দিক পরিবর্তন ঘটে তার আলোকে সত্য উন্মোচিত হয়। বৈদিক ঋষিকুল যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন—সেই সত্যকে ভৌতবিজ্ঞান এখনও খুঁজে চলেছে। পরম পূজনীয় শ্রীঅনির্বাণ বেদের রহস্য ও ভৌতবিজ্ঞানের উৎকর্ষের এক যোগসূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রদর্শিত পথে চেতনার উন্মেষ হোক এই আমাদের প্রার্থনা।

বৈদিক সভ্যতার পর গ্রিসে এক নতুন সভ্যতা দেখা দেয়। যিশু খ্রিস্টের সাতশ বছর আগে থালেস নামে এক দার্শনিক সর্বপ্রথম স্থির বিদ্যুতের সন্ধান পান। প্রায় একই সময়ে ভারতে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। বুদ্ধের ধর্মমত ভারত ও বহির্ভারতে প্রসারিত হয়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মমত নিষ্প্রভ হয়ে গেল দক্ষিণ ভারতের শঙ্করাচার্য ও বৈষ্ণবাচার্যগণের আবির্ভাবে। এই সময় থেকে শাক্ত ও বৈষ্ণববাদের প্রচলনও শুরু হয়। বেদচর্চার পুনঃপ্রচার না-ঘটলেও বেদপাঠ অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হতে থাকে, যদিও বেদমন্ত্রের প্রকৃত অর্থের অবলুপ্তি ঘটে। বেদমন্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থের প্রথম ব্যাখ্যা দেন মহামুনি যাস্ক। তিনি স্বল্পসংখ্যক শব্দের আভিধানিক অর্থ দেন।

বিদ্যুতের মতো চকিত উদ্ভাসনে প্রকাশ পেল মন্ত্রের কিছু নিগূঢ় অর্থ। চতুর্দশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের শ্রী সায়ণাচার্য সংহিতার কর্মপর ব্যাখ্যা দেন। মন্ত্রের রহস্যগত অর্থের প্রথম ব্যাখ্যা দেন শ্রীঅনির্বাণ। নিগূঢ় অর্থ বোঝার তাগিদে বোধহয় ভৌতবিজ্ঞানেরই সর্বাধিক প্রয়োজন দেখা দেয়। এক সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে যে, এই মহাবিশ্ব বিদ্যুতেরই সমাহার, বিদ্যুতের সমাবেশ। বস্তুর মূলকণা নিউট্রন, আদতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎবাহী, যা হ্যাঁ-বাচক প্রোটন ও না-বাচক ইলেকট্রন প্রবাহের উৎস। উভয় বিদ্যুৎ-সমন্বিত হওয়ায় আধানবিহীন। নিউট্রন থেকে যে স্পন্দন স্ফুরিত হয় তা ডানদিকে প্রবাহিত হলে প্রোটন, ও বামদিকে প্রবাহিত হলে ইলেকট্রন উৎপন্ন হয়। কণা বিজ্ঞান থেকে তিন তিনটি প্রাকৃতিক শক্তির সন্ধান মেলে। সবল, দুর্বল ও তড়িতচুম্বকীয় শক্তি। ভৌতবিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত সত্যঅন্বেষণে চারটি প্রাকৃতিক শক্তির খোঁজ পেয়েছে। এই শক্তিগুলির মধ্যে তিনটি কণাবিদ্যার অধীন, অন্যটি মাধ্যাকর্ষণ যা আপেক্ষিকতাবাদের মহাকর্ষীয় তত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখন এই শক্তিগুলির সমন্বয়ে এক সমীকরণের প্রয়াস চলছে। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন পরিকল্পিত একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বে আশা করা হয় মহাবিশ্বের সকল রহস্যকে ভৌতবিজ্ঞানীরা এক কথায় প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই সমীকরণ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

তন্ত্রে ও মন্ত্রে মহাবিশ্বে পাঁচ-পাঁচটি প্রাকৃতিক শক্তির সমাবেশ, অথচ ভৌতবিজ্ঞান এ পর্যন্ত চারটি শক্তির সন্ধান পাওয়ায় কোন সমীকরণে আসা সম্ভব হয় নি এবং মহাবিশ্ব কোন উপাদানে গঠিত তা নির্ণয় করা যায় নি। তন্ত্র এবং মন্ত্র উভয়ক্ষেত্রে এই মহাবিশ্ব এক বিদ্যুৎ-প্রভাবিত ক্ষেত্র দুই প্রবহমানতায় বিভক্ত। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক। একটি স্ফুরণ-প্রয়াসী, অপরটি বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধকারী এই যুগ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সকল অস্তিত্ব। ধনাত্মক ক্ষেত্র হতে বস্তুর উদ্ভব, ঋণাত্মক ক্ষেত্র হতে সংকর্ষণ শক্তির উৎপত্তি। তন্ত্রে ক্ষেত্র দুটি প্রকৃতি ও পুরুষ বৈভবে সৌন্দর্য, সামঞ্জস্য ও পূর্ণতায় সমৃদ্ধ। অপরদিকে মন্ত্রে, অগ্নি, ইন্দ্র ও সোম যেমন সৃষ্টির হেতু তেমন রুদ্র বিনাশ ও স্কম্ভ সংকর্ষণ কর্তা রূপে বিদ্যমান। অগ্নি ও ইন্দ্র বিদ্যুতের সঞ্চালক। বৈশ্বানরঅগ্নিরূপে অগ্নি সকল বস্তুর মধ্যে অনুস্যূত। এই মহাবিশ্বের সর্বত্র

বিদ্যুতের সমাবেশ, জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে, ভূলোকে, দ্যুলোকে কেবল বিদ্যুতেরই প্রবাহ। এখন এই ব্যাপারটি একটু পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, একটি পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে একটি প্রোটন ও তাকে ঘিরে ঘুরতে থাকে একটি ইলেকট্রন। এই দুই কণা নিয়ে হাইড্রোজেন পরমাণু। প্রোটন হল একটি একক ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা, ইলেকট্রন একক ঋণাত্মক সর্বশেষ কণা। অপরাপর পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে ভিন্ন-ভিন্ন সংখ্যায় নিউট্রন, প্রোটন এবং প্রোটনের সমসংখ্যায় ইলেকট্রন। নিউট্রন এক আধানবিহীন কণা, বস্তুত এটিতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ থাকায় কোন ক্রিয়া অনুভূত হয় না। নিউট্রন থেকে প্রতি বারো মিনিটের ব্যবধানে এক স্পন্দন স্পন্দিত হয় ও সেই স্পন্দন যদি ডানদিকে আবর্তিত হয় তাহলে প্রোটন ও বামদিকে আবর্তনকালে ইলেকট্রনের উদ্ভব। নিউট্রনের সঙ্গে প্রোটন তড়িতচুম্বকীয় শক্তিতে আবদ্ধ থাকায় এর বিচ্ছিন্নতায় পরমাণু শক্তির প্রকাশ ঘটে। এক সূক্ষ্ম ধূলিকণা থেকে সুদূর নীহারিকা পর্যন্ত বিদ্যুতের বিস্তার। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুতের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় বস্তুর রূপান্তর। বস্তুর বিকীর্ণতায় মহাবিশ্ব যেমন নিঃস্ব, রিক্ত হয়, অন্যদিকে ওই বিকীর্ণশক্তি, আঁধারশক্তি নিয়ন্ত্রকরূপে ঋদ্ধ হচ্ছে। মহাবিশ্ব তাই কখনও স্ফুরিত, কখনও বা সঙ্কুচিত। সংক্ষেপে বলতে গেলে মহাবিশ্ব এক বিদ্যুৎ-প্রভাবিত ক্ষেত্র, এর দুই প্রবাহ, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক, ধনাত্মক ক্ষেত্রে বস্তু আর ঋণাত্মক ক্ষেত্রে স্থিরবিদ্যুৎপ্রভাবে সংকর্ষণ, সাধারণ ভাবে মাধ্যাকর্ষণ; এর উৎস মহাশূন্যে আঁধারশক্তির বলয়ে, পাঁচ-পাঁচটি শক্তির সমন্বয়ে বিভাসিত।

বৈদিক ঋষির চিত্তে এই উদ্ভাসন বোধি দ্বারা নিষ্পন্ন, বোধি এক চরম প্রাকৃতিক গুণসম্পদ যা বিগলিত ধারায় নেমে আসে আদিত্যের অকৃপণ দানে, তাই প্রাচীন ঋষিরা বোধি উন্মেষণে যুগে-যুগে প্রার্থনা করে এসেছেন তাঁর কাছে, এই আদিত্য কখনও ইন্দ্ররূপে, কখনও বা বিষ্ণুরূপে পূজিত হয়েছেন। যে ভাবেই হোক না কেন, ভারতের গায়ত্রীমন্ত্র সেই বোধেরই উদ্বোধক। বোধির উন্মেষণে সকল যাত্রার পরিসমাপ্তি। ঋষির প্রার্থনা বৃষ্টির ধারাসারে বোধির তরঙ্গ নেমে আসুক মানুষের হৃদয়ে, হার্দিক গুণগুলি আর একবার ফুটে উঠুক আমাদের মনে, বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক।

৪

ঋগ্বেদ-সংহিতায় বৃহচ্চেতনা

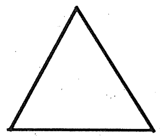
প্রকৃতির বিধান অনুসারে গাছে যেমন ফুলকুঁড়ি আসে, রঙ ধরে, গন্ধ ছড়ায় তেমনি প্রাচীন ঋষিদের চিত্তে এক যুগল শব্দ প্রকাশ হয়। সেই যুগলশব্দ আসলে সত্যমন্ত্র, সত্যকে জানার আকাঙক্ষা, জগতের মূল তথা জগৎপ্রকাশের কারণ ও জগৎ-নিয়ন্ত্রণকারকের অন্বেষণ। তাঁরা এই এষণায় ব্রতী হলেন ও প্রকাশের নেপথ্যে কোনও প্রশাসন কাজ করছে কিনা খোঁজ করছেন তখন তাঁরা তিনটি প্রাকৃতিক শক্তির সন্ধান পান এবং তাঁদের দেবতা আখ্যা দেন। এই তিন প্রধান দেবতা হলেন অগ্নি, ইন্দ্র ও সোম, এ-ছাড়া আরও দুই দেবতা নেপথ্যে কাজ করছেন, রুদ্র আর স্কম্ভ, বিনাশ ও সংকর্ষণ কর্তা, এই সংকর্ষণ শক্তি মহাবিশ্বকে ধারণ করে আছেন। দেবতাদের মূল শক্তি অর্থাৎ আঁধার শক্তি 'পূর্বগৃহ' থেকে আবির্ভূত হন, তিনি আত্মপ্রকাশের পূর্বে এক অপ্রকাশিত বিমূর্ত সত্তায় অন্তর্লীন ছিলেন যেহেতু তখন মহাজাগতিক সত্তায় সময় ও পরিসর ছিল না।

তখন অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কোনও কিছু ছিল না
মৃত্যু বা অমৃতচেতনা সেখানে কোনও দিন ছিল না,
কেবল এক আঁধার আঁধারকে গাঢ়তায় ঢেকে রেখেছিল
সেথায় না ছিল দিন বা রাত্রির আনাগোনা।
অথবা প্রাণাপানের কোন চিহ্ন ও নক্ষত্রমালা
কিন্তু এক 'ইচ্ছা' দানা বেঁধেছিল, সেটি কার কে জানে।

ঋ.স. ১০।১২৯।১,২..৭

মহাবিশ্বের মূল মহাশূন্যতা। মহাশূন্যে যেখানে অপ্রকাশিত সত্তা 'অসৎ' ও

প্রকাশিত সত্তা 'সৎ'-এর মিলন বিন্দু সেই বিন্দুটি হল 'অদিতির' উপস্থ বা যোনি। এই অদিতি দৃশ্যমান মহাবিশ্বের মাতা। ঋষি দীর্ঘতমার চিত্তে এই উদ্‌ভাসনটি প্রকাশ পায়। তাঁর চিত্তে উদ্‌ভাসিত 'উত্তান পদ' এক পারিভাষিক সংজ্ঞা, ত্রিভুজাকৃতি, এর দুই পদ বা ঊর্ধ্বমুখীন বাহু যখন একত্রে মিলিত হয়ে এক অধস্থিকোণ সৃষ্টি করে সেখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। অগ্নি মহাকাশ আবৃত করে বৈশ্বানরঅগ্নি রূপে সকল বস্তুর মধ্যে অনুস্যূত হন।



উত্তান পদ

ঋ. স. ১।১৬৪।৩৩

এই সত্যটি স্মরণে রেখে বৈদিক ঋষি দেবতার সাযুজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করলেন। ঋষি বিশ্বামিত্রের সাযুজ্যলাভের বর্ণনা ঋক্‌-সংহিতায় প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীঅনির্বাণ ওই মন্ত্রের টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ রচনা করেন। সেই ভাষ্যের কিছু অংশ পরিবেশিত হল। সম্পাদনার প্রয়োজনে স্থানে-স্থানে সংযোজন করা হয়েছে এবং তারকা চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঋগ্বেদ-সংহিতা: তৃতীয় মণ্ডল—অগ্নি ও
ইন্দ্র দেবতা, বিশ্বামিত্র ঋষি

শংসাবা হ'ধ্বর্যো প্রতি মে গৃণীহী
'ন্দ্রায় বহিঃ কৃণবাব জুষ্টম্‌
এ দং বর্হি র্যজমানস্য সীদা
'থা চ ভূদ্‌ উক্‌থম্‌ ইন্দ্রায় শস্তম্‌।। ৩।৫৩।৩

হে অধ্বর্যু, তুমি আমার সহায় হও, উত্তরসাধক রূপে আমায় শক্তি দাও — আমার কণ্ঠে দেবতার প্রশস্তি উচ্চারিত হ'ক। এ সেই প্রাচীন মন্ত্র, বারবার যাতে তৃপ্ত আর নন্দিত হয়েছেন তিনি। হে মহেশ্বর, আমি তোমার নিত্য

যজমান, আমার প্রাণের আসন এই যে বিছানো রয়েছে ওগো এসো, বসো এই আসনে। তিনি এলেন, তাই তো তাঁর বন্দনা মুক্তধারায় উৎসারিত হল আমার কণ্ঠ হতে।

তাঁর প্রশস্তি উচ্চারণ করব আমরা, হে অধ্বর্যো, আমায় অনুমোদন কর তুমি—ইন্দ্রের উদ্দেশে বন্দনার মন্ত্র রচব আমরা দুজন যা তাঁয় নন্দিত করেছে বারবার।
এই যে প্রাণের আসন যজমানের বসো এইখানে.....
তাই তো ইন্দ্রের উদ্দেশে উচ্চারিত হল প্রশস্তির মন্ত্র ।।

য' ইমে রোদসী উভে,
অহম্‌ ইন্দ্রম্‌ অতুষ্টবম্‌—
বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি
ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্‌।। ৩।৫৩।১২

যে আমি এই রুদ্রভূমির দুটি উপান্তকে আর ইন্দ্রকে আজ স্তব করলাম। সেই বিশ্বামিত্রের এই ব্রহ্মমন্ত্র রক্ষা করছে ভারতজনকে।

তাই সাধন পরিতর্পণে ঋষি প্রার্থনা করলেন।
হে দিনমণি, তুমি নব-নব সাজে কোন রহস্যমালার মাঝে গহন আঁধার অন্তরাল হতে আমাদের জাগিয়ে তোল নিত্য প্রভাতে, আবার গোধুলির অস্তরাগে কোন সুদূরের আহ্বানে মিলিয়ে যাও, মিশিয়ে যাও, না-জানার মাঝে। সেই জানার প্রত্যাশায় আমি যে বসে আছি সৃষ্টির ঊষাকাল হতে, এই জানার আগ্রহে তোমায় করি আবাহন নিশার অবসানে, নিত্যদিন, ঊষার প্রথম পদক্ষেপে।*

আ যাহ্য অর্বাঙ্‌ উপ বন্ধুরেষ্ঠাঃ
তবেদ্‌ অনু প্রদিবঃ সোমপেয়ম্‌।
প্রিয়া সখায়া বি মুচোপ বর্হিস্‌।
ত্বাম্‌ ইমে হব্যবাহো হবন্তে।। ৩।৪৩।১

দেবতা, আমার মূর্ধন্যচেতনায় দ্যুলোকপ্লাবী হিরণ্যজ্যোতিতে তুমি অধিষ্ঠিত। সেইখান থেকে তুমি নেমে এস আধারের চক্রে-চক্রে। এই-যে হৃদয় নিংড়ে সোমপাত্র পূর্ণ করে রেখেছি তোমার তরে। সেই সৃষ্টির ঊষাকাল হতে আজ পর্যন্ত আমার এ-সুধার সঞ্চয়ে একমাত্র তোমারই যে অধিকার। ভালোবাসো তুমি বজ্র আর বিদ্যুতের লীলা। তারা তোমার নিত্য সহচর। এই যে উৎশিখ প্রাণের আসন পাতা তার মধ্যে নামুক শক্তি, নামুক আলো। আমার অগ্নিষ্বাত্ত তনুর নাড়ীতে এই যে জ্বলছে উৎসর্গ আর আকূতির ঊর্দ্ধশিখা: শোন তাদের আহ্বান, ওগো এসো।

এস এইখানে, কাছে এস ; রয়েছ জ্যোতিঃছন্দে সমাসীন ;

তোমারই তরে আদিকাল হতে আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে সোমপানের অধিকার।

প্রিয় নিত্যসাথী বাহনদুটিকে মুক্ত কর এই 'বর্হিরাসনের' কাছে,

তোমায় এই হব্যবাহীরা করে আবাহন।

ঋষির ব্যাকুলতার যেন অন্ত নাই। এক একটি দিন চলে যায়, আর তার অন্তহীন অভিপ্সা ও আকুলতায় আকাশ বাতাস হয়ে ওঠে থরহরি কম্পমান। অবশেষে উন্মোচিত হয় দেবতার প্রসন্ন আনন।*

হর্যন্ন্ উষসম্ অর্চয়ঃ
সূর্যং হর্যন্ন্ অরোচয়ঃ।
বিদ্বাংশ্ চিকিত্বান্ হর্যশ্ব বর্ধস
ইন্দ্র বিশ্বা অভি শ্রিয়ঃ।। ৩।৪৪।২

হে দেবতা, এ কী জ্যোতিরুৎসব আজ আমার চেতনায়। আনন্দে ঝলমল তুমি, প্রাতিভসংবিতের অরুণ আলো ফুটিয়ে তুললে ঐ আমার দিগন্তে, আনন্দের আর এক দোলায় বিস্ফারিত করলে তাকে বিজ্ঞানের সৌরদীপ্তিতে। তোমার জ্যোতিঃশক্তিতে বাহিত হয়ে নেমে এসেছ আমার মাঝে, জেনেছ আমায়,

নিয়েছ আমার মর্মের সকল রহস্যের পরিচয়। সেই জানার আলোতে এই আধারে উপচিত হয়ে চলেছ তুমি নিত্য কল্যাণের ষোড়শকলা পূর্ণিমার পানে।

আনন্দে ঝলমল হয়ে ঊষাকে রাঙিয়ে তুললে,
সূর্যকে আনন্দে ঝলমল করে তুললে ফুটিয়ে।
জানি খুঁটিয়ে দেখ সব তুমি, হে জোতির্বাহন; এই যে উপচে চলেছ
মহেশ্বর, নিখিলব্যাপিনী শ্রীর পানে।

সেই আনন্দের অবগাহনে ঋষি হন পরিতৃপ্ত, দেবতার চরণের নুপুর ধ্বনিতে তিনি ধন্য। অঙ্গে-অঙ্গে স্পন্দন, অঙ্গে-অঙ্গে সুবাসিত চন্দন, সমর্পিত হৃদয়ে ঋষি গাইলেন*

জজ্ঞানো হরিতো বৃষা
বিশ্বম্ আ ভাতি রোচনম্।
হর্যশ্বো হরিতং ধত্ত আয়ুধম্
আ বজ্রং বাহ্বোর্ হরিম্।। ৩।৪৪।৪

আমার চেতনায় দেবতার সেই প্রথম আবির্ভাব। তাঁর হিরণ্যদ্যুতিতে সব সোনা হয়ে গেল, আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘুচল তাঁর শক্তির ধারাসারে ; আমার সব কিছু যে আজ ঝলমল করছে তাঁর বিদ্যুতের ঝলকে-ঝলকে। আলোর শক্তিরা তাঁকে বয়ে এনেছে এখানে—শুধু আমারই কান্তরূপে নয়, তিমিরবিদার রুদ্রের রূপে। তাঁর দুটি হাতের দৃঢ়মুষ্টিতে ঐ জ্বলছে হিরণ্ময় প্রহরণ, আঁধারের মর্মভেদী ঐ আলোর বজ্র—আমারই ঊর্ধ্বস্রোতা ওজঃশক্তির নির্মল দান।

যখন জন্মান হিরণ্ময় শক্তির নির্ঝর,
সবকিছুকে আভায়িত করেন, করেন ঝলমল।
জ্যোতির্বাহন ধারণ করেন হিরণ্ময় প্রহরণ
বজ্র ধরেন দুটি বাহুতে—আলোয় ঝলমল।।

চেতনায় আবেশে ঋষির হৃদয়ে কম্পন, তিনি যে হৃদয় দেবতাকে পেতে চলেছেন। মধুর মিলনের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর সর্বাঙ্গ পুলকিত।*

ইন্দ্রো হর্যন্তম্ অর্জুনং
বজ্রং শুক্রৈর্ অভীবৃতম্।
অপাবৃণোদ্ ধরিভির্ অদ্রিভিঃ সুতম্
উদ্ গা হরিভির্ আজত।। ৩।৪৪।৫

দেখলাম মহেশ্বরকে, তিমিরবিদার শুভ্র বজ্র তাঁর হাতে—ঊর্ধ্বস্রোতা আনন্দের দ্যুতিতে সে ঝলমল, শুদ্ধ-সত্ত্বের শুভ্রচ্ছটার মেরুতন্ত্র সে। আমার শুভ্র প্রত্যাহার শক্তির নিষ্পেষণে সুষুম্নতন্তুতে যে-ধারা উজান বইছিল, দেবতার ঐ বজ্রের স্পর্শে সাগর সঙ্গমের প্রাক্-ক্ষণে সহস্রদলকমলের আনন্দে অপাবৃত হল তার সঙ্গোপন ঐশ্বর্য, তাঁর চিৎশক্তির সংবেগে আধারের পর্বে-পর্বে ঘটল উত্তরবাহিনী কিরণমালার বিচ্ছুরণ।*

মহেশ্বর, ধরে আছেন আনন্দে ঝলমল শুভ্র
বজ্রকে—শুক্লচ্ছটায় ছাওয়া
অপাবৃত করলেন তিনি আলোর পাষাণ দিয়ে নিংড়ে-দেওয়া আমার আনন্দকে
উপরপানে কিরণমালাকে জ্যোতিঃশক্তির সংবেগে দিলেন ঠেলে।

সেই কিরণমালায়, বজ্র আর বিদ্যুতের লীলায়, ঘন নীল মেঘমালায় ঋষির মন ময়ূরীর মত পেখম মেলে নেচে উঠল*

আ মন্দ্রৈর ইন্দ্র হরিভির
যাহি ময়ূররোমভিঃ।
মা ত্বা কে চিন্নি যমন্, বিং ন পাশিনো
হ'তি ধন্বেব তাঁ ইহি।। ৩।৪৫।১

বজ্রসত্ত্ব, বিদ্যুতের বেগে নেমে এস এই আধারে দ্যুলোকের ওপার হতে। তোমার জ্যোতির্ময় বাহনেরা আমাদের বুকে তুলুক আনন্দের ঝড়, কলাপের ইন্দ্রধনুচ্ছটায় ঝলমলিয়ে তুলুক আমার মূর্ধন্যচেতনা। তুমি পাখির মত পাখা মেলে দাও। আমার চিত্তের কোনও ক্লেশ কোনও সংকোচ যেন তোমার স্বচ্ছন্দগতিকে ব্যাহত না করে। অনেক ধূসর ঊষরতা হয়তো আছে, তাদের শ্যামল করে' নেমে এসো গুপ্তশত্রুর সব ছলনা এড়িয়ে।

বজ্রসত্ত্ব, আনন্দে-মাতাল আলোর বাহনদের নিয়ে এসো।
আহা, ময়ূরকণ্ঠী তাদের গায়ের রং।
তোমায় কেউ যেন না আটকায় পাখীকে আটকায় যেমন পাশহাতে ব্যাধেরা
উষর ভূমির মত তাদের এড়িয়ে এসো তুমি।।

ক্রমে ঋষির কণ্ঠে প্রশস্তির সুর মন্ত্রমালার মত বিদ্যুৎময় হয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গে, নেচে নেচে, দেশের পর দেশে অদৃশ্য যাদুকরীর মত বেড়ায় ভেসে।*

গম্ভীরাঁ উদধীঁরিব
ক্রতুং পুষ্যসি গা ইব।
প্র সুগোপা যবসং ধেনবো যথা
হ্রদং কুল্যা ইবাশত।। ৩।৪৫।৩

মহেশ্বর, অপ্রমেয় তোমার মহিমা। তোমার সৃষ্টির প্রজ্ঞা আর বীর্য, বুদ্ধির কাছে যেমন রহস্যে গভীর, বোধির কাছে তেমনি ঊষার আলোর মতন স্বপ্রকাশ। তোমার স্পর্শকে হৃদয়ের গোপনে সঞ্চিত রেখেছে যারা, তোমার পথের তারা অতন্দ্র পথিক; তারা পেয়েছে তোমায় প্রাণের আরামরূপে, পেয়েছে তোমায় কুলহারা তটিনীর সাগরসঙ্গমের আনন্দে।

গভীর জলাশয়ের মত
সৃষ্টির প্রজ্ঞা আর বীর্যকে ধরে আছ ঊষার আলোর মত।
মমতায় তোমায় আগলে রেখেছে যারা, তৃণের পানে ধেনুর মত
হ্রদের পানে জলধারার মত ছুটে চলেছে তোমার পানে, পেয়েছেও।।

ঋষি জ্যোতিঃসমুদ্রে ভাসমান। অমৃত আস্বাদের তরে তিনি ব্যাকুল, আকুল চিত্তে আরাধনা করেন, পূজা করেন, প্রশস্তি কীর্ত্তন করেন। ঋষির আধারে দিব্যজ্যোতির আবির্ভাব। তিনি গেয়ে চলেন*

আ নস্ তুজং রয়িং ভরা
ঽংশং ন প্রতিজানতে।
বৃক্ষং পক্বং ফলম্ অঙ্কীব ধূনুহী
ন্দ্র সংপারণং বসু।। ৩।৪৫।৪

হে দেবতা, আনো আমাদের মাঝে মুক্তপ্রাণের সেই ক্ষিপ্র-সংবেগ, যা অশ্রান্ত অভিযানে সমুখপানে আমাদের নিয়ে যাবে। এ-সম্পর্কে আমাদের অধিকার আছে, কেননা আমরা চোখের সামনে তোমায় দেখেছি। কল্পতরুর মূলে এসে দাঁড়িয়েছি আজ,—ঝরাও তার সুপক্ক ফল, ভরাও আমাদের অঞ্জলি; বজ্রসত্ত্ব, তমিস্রার প্লাবনে নিত্য-উত্তরণ যে জ্যোতির প্রসাদ তাই আজ আমাদের দাও।

আমাদের মাঝে আনো ক্ষিপ্রসঞ্চারী সংবেগ
ও যেন তার ন্যায্যভাগ, প্রত্যক্ষ তোমায় জেনেছে যে
গাছ থেকে পাকা ফলের মত অঙ্কুশ হাতে নিয়ে ঝরাও
মহেশ্বর, এ-পার হতে ওপারে নিয়ে যাওয়া সেই আলো।।

ঋষির প্রাণ অমৃতের স্পর্শে ভরপুর, তাঁকে মাতাল করে তোলে, আনন্দে আত্মহারা ঋষি মহিমাময়ের চরমে লুটিয়ে পড়েন।*

স্বয়ুর্ ইন্দ্র স্বরাল্. অসি
স্মদ্ দিষ্টিঃ স্বয়শস্তরঃ।
স বাবৃধান ওজসা পুরুষ্টুত
ভবা নঃ সুশ্রবস্তমঃ।। ৩।৪৫।৫

মহেশ্বর, তুমি আপ্তকাম ; তুমি আত্মারাম, তুমিই তোমার রাজা, তুমিই তোমার দিশারী, তোমার ঈশনা তোমারই 'পরে—কেননা বিশ্বভুবনে তুমি ছাড়া কিছুই যে নাই। তোমার এই নিটোল পূর্ণতার ভিখারী আমরা। হৃদয়ের তন্ত্রে তাই তোমারই সুরের গুঞ্জরণ। শুদ্ধ আধারে জ্বলে উঠেছে বজ্রের শিখা ; সব নিগড় ভাঙল অনিবাধ বৈপুল্যে তুমি ছড়িয়ে পড়লে আমাদের চিদাকাশে, এইবার শুনি তোমার সহস্রক্ষরা সত্তার অনুপম ঝঙ্কার।

আপনাকেই চাও তুমি, মহেশ্বর স্বরাট তুমি
চলেছ আপন দেশনায়, আপন ঈশনায় অনুপম।
সেই তোমার অভ্যুদয় আমার ওজঃ শক্তিতে, হে 'পুরুষ্টুত'
হও আমাদের কাছে সহজশ্রুতির পরমতন্ত্র।

ঋষির পরিতৃপ্ত হৃদয় অকস্মাৎ এক অজানা আশঙ্কায় আতঙ্কিত। তিনি তার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতায় বিচলিত। তিনি বলে ওঠেন, এ নয়ত তোমার আপন ঘর। এইবার ফিরে যাও তোমার আপন ঘরে, আপন ধামে।*

পরা যাহি মঘবন্ আ চ যাহী
ন্দ্র ভ্রাতর্ উভয়ত্রা তে অর্থম্।
যত্রা রথস্য বৃহতো নিধানং
বিমোচনং বাজিনো রাসভস্য। ৩।৫৩।৫

হে জ্যোতিঃশক্তির নির্ঝর ; তুমি ফিরে যেও তোমার আনন্দধামে, আবার আমার দেবহূতি আকূতির টানে চলে এসো এইখানে। এমনি করে এপারে-ওপারে নিত্যকাল তোমার খেয়া—তোমার বিশ্রান্তি যেমন ঐ পরমব্যোমের

শূন্যতায়, তেমনি এই হৃদয়ের কমলালয়ের শূন্যতায়। দেবতা, তুমিও যেমন অদিতির তনয়, আমিও তাই—আমি যে তোমার ভাই।।

চলে যেও, হে মঘবন্ ঐখানে, আবার এসো এইখানে
হে ইন্দ্র, ভাই আমার, দুখানেই যে তোমার গতির শেষ
দুখানেই তোমার বৃহৎ রথের থেমে যাওয়া,
ছাড়া পাওয়া তোমার হ্রেষায়মাণ তুরঙ্গের।।

তাঁর মনে হয়েছে ওই আকাশবাসরেই মহেশ্বর জায়া একাকী রয়েছেন, এক নিদারুণ বেদনায় তিনি গেয়ে চলেছেন, এইবার ফিরে যাও তোমার আপনধামে।*

অপাঃ সোমম্, অস্তম্ ইন্দ্র প্র যাহি
কল্যাণীর্ জায়া, সুরণং গৃহে তে,
যত্রা রথস্য বৃহতো নিধানং
বিমোচনং বাজিনো দক্ষিণাবৎ। ৩।৫৩।৬

এইখানে আমার হৃদয়ের উচ্ছলিত অমৃতধারায় তৃপ্ত হয়েছ, হে মহেশ্বর এইবার ফিরে যাও তোমার আনন্দধামে। সেই আকাশবাসরেই তোমার পরম বিশ্রান্তি—কল্যাণী ইন্দ্রাণীর হৃদ্যসমুদ্রের গভীরে তাঁকে জড়িয়ে তোমার স্বধার আনন্দের অজস্র উচ্ছলনে। সেইখানে গিয়ে থামুক তোমার আলোর রথ, জ্যোতির্বাহনেরা বিশ্রান্ত হ'ক তোমার দাক্ষিণ্যে।

পান করেছ, সৌম্যসুধা, স্বধামে এবার যাও হে মহেশ্বর।
কল্যাণী তোমার জায়া, আনন্দের উচ্ছলন ঘরে যে তোমার
যেখানে এই বৃহৎ রথের থেমে যাওয়া,
ছাড়া পাওয়া তোমার তুরঙ্গের—দাক্ষিণ্যের সাথে।।

বিসর্জনের বিষাদে ঋষির চিত্তে হাহাকার। কিন্তু মূহূর্তের উদ্ভাসিত চেতনায় আত্মবিস্মৃত ঋষি বলেন, তাইতো, দেবতার সাযুজ্য তো লাভ করেছি, সেটাই তো পরম প্রাপ্তি।*

ইমে ভোজা অঙ্গিরসো বিরূপা
দিব্স্ পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ
বিশ্বামিত্রায় দদতো মঘানি
সহস্রসাবে প্র তিরন্ত আয়ুঃ। ৩।৫৩।৭

হে দেবতা, পরম ব্যোমের নৈঃশব্দ্যে নিলীন হয়ে গেলে তুমি, কিন্তু আমার 'পরে রেখে গেলে দেবলোক আর পিতৃলোকের অকৃপণ দাক্ষিণ্য। এই-যে আমায় ঘিরে আনন্দোচ্ছল মরুদ্‌গণের জ্যোতির্ময় প্রাণের প্লাবন, এই যে দেবায়িত অঙ্গিরোগণের অগ্নিবীর্যের নিরন্ত প্রৈষা, তোমার বিদ্যুদ্দীপনীর এই তো অবন্ধ্য পরিণাম। দ্যুলোকের পুত্র তাঁরা, অনুত্তরের বীর্যবিভূতি তোমারই জ্যোতিঃশক্তির বিচিত্র প্রসাদকে ঝলকে-ঝলকে নামিয়ে আনছেন বিশ্বামিত্রের আধারে। সেই আলোর ছোঁয়ায় প্রস্ফুরিত তার জীবন হ'ক অন্তহীন উত্তরায়ণের অশ্রান্ত পথিক, পৃথিবীর 'পরে অবিপ্লুত অমৃতচেতনার সহস্র নির্ঝর।

এই যে আনন্দময় মরুদগণ, এই যে দিব্যরূপ অঙ্গিরোগণ,
দ্যুলোকের পুত্র তাঁরা, 'অসুরের' বীর্যবিভূতি ;
বিশ্বামিত্রকে দিন তাঁরা জ্যোতিঃশক্তির অজস্রতা
সৌম্যসুধার সহস্রনির্ঝরণে এগিয়ে নিয়ে চলুন তার স্ফুরন্ত জীবনকে।

ঋষি এখনও আনন্দের রসে রসায়িত, যদিও শূন্য বাসর, শূন্য হৃদয়, তবুও বিরহের যাতনা এক সুখের আবেশ ও স্পন্দনে পূর্ণ। মনে মনে গুঞ্জরণ।*

পরা যাহি, আ চ যাহি। চলে যাও তোমার আপনধামে, আবার নেমে এসো আমার মাঝে। চিদাবেশ সব সময় সমান মাত্রায় থাকে না, তার মধ্যে জোয়ারভাটা খেলে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সা রে গা মা পা ধা নি। কিন্তু নিতে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। তাই দেবতা আসেন যান, তাঁর আবাহন বিসর্জন আছে। কিন্তু তাঁর জ্যোতির শক্তি জীবনটাকে পালটে দিয়ে যায়, তাঁর আবেশের সংস্কার বিজ্ঞানীর চেতনায় ধ্রুবা স্মৃতি হয়ে জেগে থাকে। তাঁর সাযুজ্যের গৌরবে গরবী হয়ে তখন তাঁকে বলতে পারি, হে ইন্দ্র ভ্রাতঃ মহেশ্বর, তুমি যে আমার ভাই, তুমিও অদিতির তনয়। আমিও যে তাই।

৫
আর্যঋষির বহির্ভারত যাত্রা

তখন সবে চাষ আবাদ শুরু হয়েছে। শস্যের গোলা পূর্ণ হয়েছে তাই আবেগের ঢল নেমেছে। অন্তরের আবেগ বশে আকুলতার আভাস দেখা দিয়েছে। মানুষ প্রকৃতির কাছে আত্মনিবেদন করল। চাষের জন্য জলের প্রয়োজন তাই তার প্রয়োজনের কথা সে জানাল তার একান্ত ভঙ্গিমায়। তার আর যা প্রয়োজন তা সে প্রকৃতির কাছ থেকে পেতে চাইল, শুরু হল প্রার্থনা। ক্রমে তারা বুঝেছিল সে ও প্রকৃতি অভিন্ন। এই বিশ্বজগতের যা কিছু সবই তার আপন, একে অপরের পরিপূরক।

ঋষি বিশ্বামিত্রের মন্ত্রে পাওয়া যায় ঈশ্বরের সাযুজ্যলাভের নির্দেশনা আসলে এটা একটা আদল, যার উপর ভিত্তি করে মানুষ এতকাল ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে এল। সেই দর্শনবোধ বা পরিকাঠামো মানুষকে নানা প্রেরণা জুগিয়েছিল, সঙ্গীত, কলা, নৃত্য সাহিত্য সব কিছুরই ভিত্তি ছিল এই বোধ। একটি সূক্তে দেখা যায়। ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁর অনুরাগী কুশিকদের নিয়ে চলেছেন সম্ভবত চাষযোগ্য জমির সন্ধানে যা আমরা জানব ৩৩শ সূক্তের মূল ঋকগুলি থেকে।

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে নদীর কথোপকথন সূক্তটির বিষয়বস্তু, এই প্রসঙ্গে সায়ণ একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করেছেন। বিশ্বামিত্র সুদাস রাজার পুরোহিত ছিলেন, দক্ষিণার ধনসম্পদ নিয়ে বিপাশা আর শতদ্রুর (বৈদিক নাম বিপাট্ আর ছুতুদ্রী) সঙ্গমে পৌঁছে দেখলেন নদীর জল গভীর, পার হওয়া যায় না। সঙ্গে অনেক লোকজন ছিল, সবাই যাতে নির্বিঘ্নে নদী পার হতে পারে তার জন্য প্রথম তৃচটি উচ্চারণ করলেন নদী দুটির উদ্দেশে। নদীরা জবাব দিল, এমনি করে আলাপ শুরু হয় বিশ্বামিত্রের সঙ্গে নদীগুলির। [দ্র. নি. ২/২৪] আখ্যায়িকার মধ্যে সরস কবি কল্পনা ছাড়া অযৌক্তিক কিছুই নাই। বিশ্বামিত্র একটি তীর্থ (ford) আবিষ্কার করবার চেষ্টায় ছিলেন, অগস্ত্যের মত তিনিও

অনুসন্ধিৎসু। তাঁর অধ্যাপনা আর অভিজ্ঞতার কথা কবির ভাষায় বর্ণনা পূর্বেই করা হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, সূক্তটির বিনিয়োগ বৈদিক। ঋগ্বেদের স্বল্প সংখ্যক লৌকিক কবিতার মধ্যে এটি একটি। কবিত্বের স্ফুরণে অন্যান্য লৌকিক কবিতার মত এটিও মনে একটা মুগ্ধ বিস্ময়ের ছাপ রাখে। নদীর একটি অলৌকিক অর্থ আছে, সূক্তটিতে জায়গায় জায়গায় তার ছায়া পড়েছে। ঋষিকবির মানস-পরিমণ্ডলের সঙ্গে তা বেমানান হয়নি।

প্র পর্বতানামুশতী উপস্থাদশ্বে ইব বিষিতে হাসমানে।
গাবেব শুভ্রে মাতরা রিহাণে বিপাট্ ছুতুদ্রী পয়সা জবেতে।।১

উতলা তারা, পাহাড়দের কোল হতে
বাঁধনহারা দুটি তুরঙ্গের মত রেষারেষি করে ছুটে চলেছে,
শুভ্র দুটি গাভীমাতা যেন — লেহন করে বাছুরদের।
বিপাশা আর শতদ্রু জলের খরস্রোত নিয়ে বয়ে চলেছে।

পর্বতানাম্ উপস্থাদ্ — পাহাড়দের কোল থেকে। যেখানে নদী দুটির সঙ্গম সেখানে কিন্তু পাহাড় নাই। তবু পাহাড় হতে সমুদ্র পর্যন্ত নদীর সম্পূর্ণ ধারাটির ছবি ঋষির মনে জেগে উঠেছে। নদী জলের ধারা, প্রাণের ধারা। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তাই আমার দেহ যদি পৃথিবী, তাহলে নদী হল নাড়ী। [নদীর সাধারণ নাম সরস্বতী (নিঘ ১।১৩); আবার সরস্বতী আর নদী দুই-ই বাকের নাম (নিঘ ১।১২)। (নিঘ ১।১১, বাক্ ব্রহ্মশক্তি, সরস্বতী চিৎশক্তির প্রবাহ, পুরাণে ব্রহ্মাণী)] এই নাড়ীতে বইছে প্রাণের স্রোত—ব্যক্তিচেতনা হতে বিশ্বচেতনার দিকে যখন তখন উজান, আবার বিশ্বচেতনা হতে ব্যক্তিচেতনায় যখন তখন ভাটি, দুয়েরই উৎস পর্বত অর্থাৎ অদ্রির বেষ্টনী। ইন্দ্রের বজ্র তার বাধাকে বিদীর্ণ করে, একথা একটু পরে নদীরাই বলছে, উভয়েরই গতি সমুদ্রে। উজানধারা পৌঁছয় চিৎসমুদ্রে, আর ভাটার ধারা হৃদ্য সমুদ্রে। নদী আর নাড়ী তন্ত্রে পুরাণে একার্থক। বেদে আছে সপ্তসিন্ধুর কথা, সপ্ত অরোর কথা, সপ্তলোকের কথা। আজও স্নান মন্ত্রে সাতটি নদীকে আমরা আবাহন করি। **উশতি** — [সমুদ্রের জন্য] উতলা। **বিষিতে** — [বি + √সি (বাঁধা) +

ক্ত, + আ—১দ্বি] বন্ধনমুক্ত। **হাসমানে** — [তু মরুতাং পৃৎসুতি হার্দমানা ১।১৬৯।২ ; নাবাজিনং বাজিনা হাসয়ন্তি ৩।৫৩।২৩ ; কৃশং ন হাসুরঘ্ন্যাঃ ৮।৭৫।৮; এয সূর্যেণ হাসতে পবমানো অধি দ্যবি ৯।২৭।৫ ; অপেদু হাসতে তমঃ ১০।১২৭।৩ ; মা হাস্মহি প্রজয়া মা তনূভি ১০।১২৮।৫। < √হা (স্) (ছুটে চলা, সামনে ছোট ; রেষারেষি করা)] পরস্পর রেষারেষি করে ছুটে চলেছে। **গাবেব শুভ্রে মাতরা রিহাণে**— শুভ্র দুটি গাভীমাতা বাছুরদের চাটতে চাটতে যেন চলেছে। নদীর ফেনা জিভের মত। অশ্বের উপমা, স্বভাবতই নদীর বেগও শক্তিকে মনে করে, আর গাইয়ের উপমা তার স্নেহ ও বিগলিত মাধুর্যকে মনে করে। 'গো' আলোর প্রতীক, তাই শুভ্র গাভীর উল্লেখ। **বিপাট্ ছুতুদ্রী**—বিপাশ ও শুতুদ্রী), কুল ভেঙ্গে বাঁধনহারা হয়ে চলে বলে বিপাশ, আধুনিক নাম বিয়াস্। তাড়াতাড়ি (আশু=) ছোটে বলে শুতুদ্রী (< √তুদ্ (ছোটানো) আধুনিক নাম Sutlej)। বর্তমান অমৃতসরের দক্ষিণপূর্বে দুয়ের সঙ্গম।

ইন্দ্রষিতে প্রসবং ভিক্ষমাণে অচ্ছা সমুদ্রং রথ্যেব যাথঃ।
সমারাণে ঊর্মিভিঃ পিন্বমানে অন্যা বামন্যামপ্যেতি শুভ্রে।।২

ইন্দ্রের প্রেষণায় চলেছ তারই প্রণোদন চাইছ তোমরা
সমুদ্রের পানে রথীর মত চলেছ,
চলেছ গলাগলি, ঢেউ এ ঢেউ এ ফুলে উঠেছ —
দুজনার একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরছ শুভ্র হয়ে।

ইন্দ্রষিতে প্রসবং ভিক্ষমাণে— ইন্দ্রের প্রেষণা তোমাদের গতির মূলে, তোমরা চাও তাঁর প্রচোদনা (প্রসবং) ইন্দ্রই রুদ্ধ প্রাণের অবরোধ ভাঙেন। **সম্‌আরাণে** — [সম্ + ঋ(চলা) + কানচ্] গলাগলি হয়ে ছুটে চলেছ।

অচ্ছা সিন্ধুং মাতৃতমাময়াসং বিপাশমুর্বীং সুভগামগন্ম।
বৎসমিব মাতরা সংরিহাণে সমানং যোনিমনু সঞ্চরন্তী। ৩

প্রবাহিনী শতদ্রুর কাছে এসেছি — অমন মা আর হবে না।
বিশালাকল্যাণী বিপাশার কাছে আমরা এসেছি।
সন্তানকে যেন মায়েরা স্নেহে লেহন করছে ;
একই সঙ্গমস্থলের পানে ছুটে চলেছে দুজনায়।

সিন্ধুং — নদীর সাধারণ নাম যেমন অনার্য ভাষায় গাঙ্ > গঙ্গা **মাতৃতমাম্** — নদীর প্রতি এভাব আজও আছে। [তু. সরস্বতী সুক্ত] **সুভগা** — সুমঙ্গলা, ভগ আবেশ জনিত আনন্দ। **যোনিম্** — সঙ্গমস্থল, সমুদ্র।

এনা বয়ং পয়সা পিন্বমানা অনু যোনিং দেবকৃতং চরন্তীঃ।
ন বর্তবে প্রসবঃ সর্গতক্তঃ কিং যুর্বিপ্রো নদ্যো জোহবীতি।। ৪

এই যে আমরা জলের তোড়ে ফুলে উঠেছি
দেবতার-রচা সঙ্গমের পানে চলেছি।
কেউ ঠেকাবে না আমাদের প্রবাহের প্রেরণায় এই ঝোঁককে
কী চায় এ-ভাবুক — নদীদের ডাকছে যে।

এনা — এনেন। ন বর্তবে — কেউ বারণ করতে পারবে না। **প্রসবঃ** — সামনে ছোটবার ঝোঁক। **সর্গতক্ত** — [তু. সর্গ প্রতক্ত সিন্ধুর্ণ ক্ষোদঃ ঈং বরাতে ১।৬৫।৩, 'সর্গ' স্রোত, প্রবাহ তার দ্বারা, 'তক্ত' প্রেরিত, প্রচোদিত < তক্ (ছুটে চলা) তু. তকৎ...] প্রবাহ দ্বয় দ্বারা প্রেরিত হয়ে। **কিং যুঃ** — [কিম্+ইচ্ছার্থে য+উ, ১-এ] কী চায়?

রমধ্বং মে বচসে সোম্যায় ঋতাবরীরূপ মুহূর্তমেবৈঃ।
প্র সিন্ধুমচ্ছা বৃহতী মনীষাবস্যুরহ্বে কুশিকস্য সূনুঃ।। ৫

নাম তোমরা আমরা এই সুধাক্ষরা বাণীতে
হে ঋতাবরী একটি মুহূর্ত থাম চলন হতে
শতদ্রুর ধারাকে আমার কূল ছাপানো এই মনের
উচ্ছলনে প্রসাদ যেচে ডাকছি আমি কুশিকের ছেলে।।

উপরমধ্বংম্ — উপরত হও, থাম তোমরা। **সোম্যায় বচসে** — মধুক্ষরা এই বাণীতে। **ঋতাবরী** — তোমরা ঋতময়ী। প্রাণের মুক্ত প্রবাহ সব অনৃতকে ভাসিয়ে নেয়। **এতৈঃ** — চলন হতে। পঞ্চম্যর্থে তৃতীয়া (সা)। **বৃহতী মনীষা** — মনের কূলছাপানো ঝলক দিয়ে-যা কাব্যের উৎস। **অবসুঃ** — আমি প্রসাদ চাই তোমাদের।

ইন্দ্রো অস্মাঁ অরদদ্বজ্রবাহুরপাহন্বৃত্রং পরিধিং নদীনাম্।
দেবোহনয়ৎ সবিতা সুপাণিস্তস্য বয়ং প্রসবে যাম উর্বীঃ।। ৬

ইন্দ্র আমাদের গতি রচনা করলেন বজ্রবাহু হয়ে,
আঘাত হেনে সরিয়ে দিলেন বৃত্রকে—ঘিরে ছিল যে নদীদের,
জ্যোর্তিময় সবিতা আমাদের নেতা হলেন, কল্যাণপাণি তিনি
আমরা তাঁরই প্রেষণায় চলেছি বিপুলা হয়ে।

পরিধিং — ঘিরে আছে যে, প্রাণের ধারায় অবরুদ্ধ হয়ে আছে জড়ত্বের পাষাণকারায়। **অনয়ৎ** — আমাদের নিয়ে চলেছিলেন, নেতা হয়ে ছিলেন, সবিতার অধ্যাত্মপ্রেরণা শক্তিপাতের সঙ্গে তুলনীয়। **উর্বীঃ** — বিপুলা হয়ে ক্ষীণধারা ক্রমে পরিণত হয় দুকূল ছাপানো প্লাবনে।

প্রবাচ্যং শশ্বধা বীর্যং তদিন্দ্রস্য কর্ম যদহিং বিবৃশ্চত্।
বি বজ্রেণ পরিষদো জঘানায়ন্নাপোহয়নমিচ্ছমানাঃ।। ৭

হ্যাঁ মুক্তকণ্ঠে বলতে হবে চিরকাল সেই বীর্যকাহিনী
ইন্দ্রের সেই কর্ম — যখন অহিকে খণ্ড-খণ্ড করলেন,
বজ্রের ঘায়ে চূর্ণ করলেন যারা চারদিকে ছিল,
চলল ধারারা — চলবার তরে উতলা হয়ে।

শশ্বধা — চিরকাল। **বিবৃশ্চৎ** — টুকরো-টুকরো করেছিলেন। **পরিষদঃ** — চারদিকে ঘিরে আছে যারা। **অয়নম্** — গতি, মুক্তপ্রবাহ।

এতদ্বচো জরিতর্মাপি মৃষ্ঠা আর যত্তে ঘোষামুক্তরা যুগানি।
উক্‌থেষু কারো প্রতি নো জুষস্ব মানো নি কঃ পুরুষত্রা নমস্তে।। ৮

এই কথাটি, ওগো কবি, মুছে ফেলো না মন থেকে
তোমার বাণীই যে ঘোষিত হবে উত্তরকালের দ্বারা।
তোমার বাণীর সাধনায়, হে কবি, আমাদেরও ঠাঁই দিও আদর করে'
আমাদের খাটো করো না লোকের মাঝে, তোমায় নমস্কার।

জরিত — হে গায়ক, হে কবি। **মা অপি মৃষ্ঠাঃ** — ভুলে যেওনা, আমাদের মুক্তধারার কথা মনে রেখো। **ঘোষান্** — ঘোষণা করবে, তোমার এই বাণী ভাবী যুগেও ঘোষিত হবে। **উক্‌থেষু** — বাণীর সাধনায়। **প্রতি জুষস্ব** — আমাদের সেবা কর, গান গাইবে যখন, আমাদের কথাও গেও। **মা নি কঃ** — খাটো করো না। **পুরুষত্র** — লোকের মাঝে আমরা যে মুক্তধারায় বইতে চাই একথা স্বীকার কর। আমরা যদি অবরুদ্ধ থাকি, সে আমাদের দোষ নয় — তার জন্য দায়ী অচিতির অন্ধপাষাণ, আমরা যে কল্যাণী এই কথাই মনে রেখো।

ও যু স্বসারঃ কারবে শৃণোত যযৌ বো দূরাদনসা রথেন।
নি যু নমধ্বং ভবতা সুপারা অধোঅক্ষাঃ সিন্ধবঃ স্রোত্যাভিঃ ।। ৯

ওগো বোনেরা, কবির কথা শোন তবে,
এসেছে সে তোমাদের কাছে দূর হতে — গোযান আর রথ নিয়ে।
অনেকখানি নেমে যাও — পার হতে কষ্ট না হয় যেন;
অক্ষের নীচে থাক, ওগো নদীরা, স্রোতের বেগ নিয়ে।।

ও — নিরর্থক অব্যয়। **অনসা রথেন** — গরুর আর ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে। **অধোঅক্ষা** — অক্ষ বা চক্রদণ্ডের নীচে আছে যারা। নদীর জল ছাপিয়ে অক্ষের উপরে যেন না উঠে। **স্রোত্যাভিঃ** — স্রোত নিয়ে।

আ তে কারো শৃণবামা বচাংসি যযাথ দূরাদনসা রথেন।
নি তে ন'সৈ পীপ্যানেব যোষা মর্যায়েব কন্যা শশ্বচৈ তে।। ১০

তোমার কথা, হে কবি, শুনব আমরা,
এসেছ দূর থেকে গোযান আর রথ নিয়ে।
তোমার কাছে নুয়ে পড়ছি আমি — যেন স্তন দিতে মায়ের মত,
বঁধুকে যেমন কুমারী মেয়ে জড়িয়ে ধরে তেমনি জড়িয়ে ধরি তোমাকে।

নিনংসৈ — আমি শুয়ে পড়ব। **পীপ্যানা** — স্তন্যদাত্রী। **মর্যায়** — যুবার কাছে। **শশ্বচৈ** — অনন্য প্রয়োগ। ভাষ্যকার বলেন ধাতুটি স্বজ। সম্ভবত সচ্ এবং শ্বজ্ দুয়ের মিশ্রণ। [শ্বচ্ (আলিঙ্গন করা)+লোট্ ঐ] জড়িয়ে ধরি।

যদঙ্গ ত্বা ভরতাঃ সন্তরেযুঃগর্ব্যন্ গ্রাম ইষিত ইন্দ্রজূতঃ।
অর্ষাদহ প্রসবঃ সর্গতিক্ত আ বো বৃণে সুমতিং যজ্ঞিয়ানাম্।। ১১

যখন, ওগো বোন, তোমার ভরতেরা পার হয়ে যাবে, —
আলোকসন্ধানীর দল তারা, ইন্দ্রের প্রেষণায় ছুটে চলেছে —
আবার ছুটে চলে যেন তোমার ধারা প্রবহণের প্রেরণায়।
চাই তোমাদের প্রসন্নতা — সাধনার ধন তোমরা।।

গব্যন্ — আলোর সন্ধানী। গ্রামঃ — দল। **ইষিতঃ ইন্দ্রজুতঃ** — তোমরা যেমন ইন্দ্রের প্রেরণায় বয়ে চলেছ আমরাও তেমনি পার হতে এসেছি তাঁরই প্রেরণায়। **অর্ষাদ্** — যেন ছুটে চলে।

অতারিষুভক্ষরতা গব্যবঃ সমভক্ত বিপ্রঃ সুমতিং নদীনাম্।
প্র পিন্বধ্বমিষয়ন্তীঃ সুরাধা আ বক্ষণা; পৃণধ্বং যাত শীভম্।। ১২

পার হয়ে গেল ভরতেরা —আলোর সন্ধানী তারা
পেল ভাবুক সাধক নদীদের প্রসন্নতা।
ফুলে ওঠ ছুটতে-ছুটতে, সিদ্ধি তোমাদের সুনিশ্চিত।
স্রোতের খাত আপূর্ণ কর — ছুটে চল তাড়াতাড়ি।

ইষয়ন্তী — ছুটে চলতে-চলতে। **সুরাধাঃ** — সিদ্ধি যাদের অনায়াস, নিশ্চিত যারা সমুদ্রে পৌঁছাবে। **বক্ষণাঃ** — জল বইবার খাত। **শীভম্** — [তু. প্র যাতশীভম্ অস্তভী: ১।৩৭।১৪, **শীভং রাজন্ সুপথা যাহ্যর্বাঙ্** ১০।৪৪।২] তাড়াতাড়ি।

উদ্ব উর্মিঃ শম্যা হন্ত্বাপো যোকত্রাণি মুঞ্চত।
মাদুষ্কৃতৌ ব্যেনসাঘ্নৌ শূনমারতাৎ।। ১৩

তোমাদের ঢেউ-এর দোলা সাজের দড়িদড়াকে নাচিয়ে তুলুক,
হে জলের ধারা, দড়িদড়াকে ভাসিয়ে নিও না।
কোনও অন্যায় করেনি, নিষ্পাপ
এই দুটি ষাঁড়, তাঁদের যেন সর্বনাশ না হয়।।

শম্যা: — [যুগ কণ্ঠপার্শ্বার্দিলগ্না: রজ্জব: (সা) pins.(G)] সাজের দড়িদড়া। **যোকত্রানি** — ঐ (সা)। **অদুষ্কৃতৌ** — খারাপ কিছু করেনি যারা কোনও দিন। **ব্যেনসৌ** — নিষ্পাপ। অঘনৌ — ষাঁড় দুটি। তখনই গোহত্যা অননুমোদিত ছিল। **শূনম্** — রিক্ততা, সর্বনাশ, মৃত্যু, শূন্যতা।

আজও হরপ্পা ও মহেঞ্জদারো অবলুপ্তের সম্পূর্ণ কারণ অজানা থেকে গেছে। অনুমান করা হয় রাজা সুদাস ও ঋষি বিশ্বমিত্রের সঙ্গে যে সংঘর্ষ হয়েছিল সেই কারণে, অথবা তন্ত্র ও মন্ত্র দুই ধারার বিরোধে এই বিধ্বংসী যুদ্ধের অবতারণা। যে কারণেই হোক না কেন, সংহিতার সপ্তম মণ্ডলে মুনি বসিষ্ঠের অনুতাপ ও অনুশোচনার জ্বালা এই যুদ্ধের সাক্ষ্য বহন করছে। ঋষি বিশ্বামিত্র ও মুনি বসিষ্ঠ যথাক্রমে যজ্ঞের পুরোহিত ও গৃহের কুলপুরোহিত ছিলেন। উভয়েই পৌরোহিত্য করতেন; ঋষি সম্ভবত বৈদিকধারায় ও মুনি তন্ত্রধারায়; এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা নিয়ে সংঘর্ষের সূচনা। যুদ্ধের দামামায় আকাশ-বাতাস থরথরি কম্পমান হয়ে উঠল। রুধিরের স্রোত বহে চলে। দুন্দুভি ও আর্তনাদে শত সহস্র বজ্র ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। সংগ্রামের ফলে নেমে আসে হাজার বছর শ্মশানের নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করে ঋষির উত্তরসূরিরা একদিন শিকড়ের সন্ধানে নিজেদের জন্মভূমিতে ফিরে আসেন, তাঁদের সেই প্রত্যাবর্তনকে কেউ কেউ আর্যদের ভারত আক্রমণ বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুত এই উত্তরসূরিরাই ভারতে প্রত্যাবর্তন করে অবলুপ্ত বেদ-মন্ত্রের পরিশীলিত রূপ দেন উপনিষদে। বেদ-মন্ত্রগুলিই উপনিষদে পরিমার্জিত রূপে পরিবেশিত হয়েছে। উপনিষদের ব্রহ্মভাবনা সংহিতার "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"র বিস্তৃত রূপ।*

৬

পারিভাষিক সংজ্ঞা

অগ্নি - দ্যুলোক হতে জাত, মর্ত্য আধারে আবির্ভূত আলোর শিশু রূপে, আমাদের মাঝে তিনি বিশ্বপ্রাণের নবজাতক, মৃত্যুর গহনে অমৃততত্ত্বের নিত্যসাধক। জন্ম হতে জীবসাক্ষী, প্রদীপ্ত চক্ষু, অভীপ্সার শিখা, ছেয়ে আছেন প্রাণলোক।

অহি - মেঘমণ্ডল

অদিতি - আদ্যাশক্তি।

অধস্ত্রিকোণ - নিম্নমুখী কোণ।

অন্তর্মুখী পথ - অন্তর অর্থাৎ বাহ্যবস্তু পরিহার করে পরমাত্মার দিকে নিবিষ্ট চিত্তে এগিয়ে চলা।

অন্তর্যামিত্ব - অন্তরে আবিষ্ট

অসৎ - সত্তাবিহীন, যে বস্তু অপ্রকাশিত।

আকর্ষণী শক্তি - নিউটনের গতিতত্ত্বে বল ও ত্বরণের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তা হল দুটি বস্তুকণা যে কোন দূরত্ব থেকে পরস্পরকে আকর্ষণ করে একটি বলের দ্বারা যার মান হল ঐ বস্তুদুটির গুণফলের সমানুপাতিক এবং তাদের ভিতরের দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত অনুপাতিক। বস্তুর উপর বস্তুর যে আকর্ষণ।

আপেক্ষিকতাবাদ - বিশ্বে কোন বস্তু স্থির নয়। প্রতিটি গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য, পৃথিবী সকলসময় গতিতে আছে বলে প্রতি মুহূর্তে বস্তুগুলির একের আপেক্ষিকে অপরের স্থান পরিবর্তিত হচ্ছে এবং গাগনিক বস্তুগুলির ধ্রুব বা কোন এক নির্দিষ্ট

স্থানে অবস্থিতি কেউ বলতে পারে না। এদের অবস্থিতি বের করতে হবে অন্যদের আপেক্ষিকে।

আধারশক্তি - মহাবিশ্ব প্রকাশের পূর্বে বস্তুর বিকীর্ণ ঘনীভূত শক্তি— 'অসৎ'।

ইন্দ্র - স্বরাট, ঋগ্বেদের মহেশ্বর, স্থাবর জঙ্গমের অধীশ্বর, ঈশ্বর। পুরাণের বিষ্ণু ও ভাগবতের কৃষ্ণ।

ইলেকট্রন - প্রতি বস্তুর মধ্যে ঋণাত্মক বিদ্যুতের আকারে যে খন্ড-খন্ড বিদ্যুতের সমাবেশ, তার সর্বশেষ অংশটির একক হল ইলেকট্রন।

ঈশনা - প্রশাসন্।

উচ্ছিষ্ট - যজ্ঞ থেকে উদ্ভুত। মহাবিশ্ব সৃষ্টি এক যজ্ঞ কর্ম, এই চেতনায় যা কিছু দৃশ্যমান।

উপস্থ - যোনি।

উত্তান পদ - মহাশূন্যতা বিশ্বের মূলাধার। অসৎ আর সৎ দুইই এই পরম ব্যোমে, যা আদ্যাশক্তি অদিতির উপস্থ বা যোনি। সংহিতায় তার একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা 'উত্তান পদ' যার রেখাচিত্র হল এমন একটি দ্বিসমবাহু ত্রিভুজ যার দুটি ভূজ বা পদ উত্তান বা ঊর্ধ্বমুখ এবং শীর্ষবিন্দু অধোমুখ। সেই অধস্ত্রিকোণ হতে জন্মাল 'সৎ' বা ভূত বীজ এবং তার সঙ্গে মিথুনীভূত 'ভূঃ' বা সম্ভূতির প্রবেগ। দর্শনের ভাষায় একটি চিদ্‌বীজ, আরেকটি তার স্ফুরত্তা। সৃষ্টির মূলে পরা বাক্ গৌরীর সাবিত্রী শক্তির প্রচোদনা, তাই এই 'ভূঃ' ব্রাহ্মণে হয়েছে প্রজাপতির 'ব্যাহৃতি' বা আত্মজননের মন্ত্র। পরমব্যোমে যা বীজশক্তিরূপে 'ভূঃ' এখানে তাই 'আশা' বা ব্যাপ্তিধর্মের বৈভবে প্রথিত হয়েছে 'পৃথিবী' রূপে।

ঋণাত্মক শক্তি - পরমাণুর আভ্যন্তরিক গঠনে দেখা যায়. স্বাভাবিক ভাবে পরমাণু বিদ্যুৎআধান নিরপেক্ষ, কিন্তু পরমাণুর কেন্দ্রে একটি ভরযুক্ত কঠিন বস্তু আছে যা ধনাত্মক বিদ্যুৎহিত।

এই বিদ্যুৎকে প্রতিরোধ করবার জন্য পরমাণুর ভিতরে থাকতেই হবে সমপরিমাণে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ। যা হল বিচ্ছিন্নতার প্রতিরোধক, অর্থাৎ পূর্ব্বস্থায় ফিরে আসার প্রয়াস।

একীভূতক্ষেত্রতত্ত্ব - আইনষ্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদতত্ত্বে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের পরিবর্তন করে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। এই দুই ক্ষেত্রের নিয়মাবলী কি করে একীভূত করা যায় তাই হল আধুনিক ভৌতবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য। মহাকাশের একটি মহাকর্ষীয় ও অপরটি বিদ্যুৎচুম্বকীয় এইরূপ দুটি বাস্তব বিষয়ের পরস্পরের অনন্যগত গঠন থাকতে পারে এই ধারণা তত্ত্বীয় জ্ঞানে সমর্থন করা যায় না। যেহেতু শক্তিকে ক্ষেত্রের ধারণায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বস্তুর মূল গুণ জাড্যকে ক্ষেত্রের ধারণায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সমস্ত বিশ্বকে ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কিছু নয় বলে ধারণা করা যেতে পারে। যেখানে ক্ষেত্রের ঘনত্ব কম সেখানে শক্তি এবং যেখানে ক্ষেত্রের ঘনত্ব বেশী সেখানে বস্তু। এই হবে পদার্থতত্ত্ব বিদ্যার পরম সত্যলাভ।

এষণা - অন্বেষণ বা গবেষণা।

কণাবলবিদ্যা - সনাতন পদার্থতত্ত্ববিদ্যার মতবাদে প্রকৃতির দুর্বোধ রহস্য অধিগত না হওয়ায় প্রচলিত তত্ত্ব ও মতবাদের স্থানে পরিসংখ্যান, অনিশ্চয়তা ও সম্ভাব্যতা কণা বলবিদ্যায় আত্মপ্রকাশ করে। যখন একটি কঠিন বস্তুকে গরম করা হয় তখন বস্তুটির কণিকাগুলি গতিশক্তি পায়। কঠিন বস্তুতে প্রতিটি কণিকা তার চারপাশে অবস্থিত কণিকাগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে এবং এইসব কণিকা অভ্যন্তরের কণিকাটিকে চেপে ধরে রাখতে চেষ্টা

করে। তাপের পরিমাণ বাড়তে থাকলে কতকগুলি কণিকার গতিশক্তি অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপায় যার ফলে এই কণিকাগুলি তাদের পরিবেষ্টনকারী কণিকাগুলির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয় এবং স্বাধীন ভাবে নড়া-চড়া করে থাকে। এরকম কার্য-বিধির ব্যাখ্যাতে পরিসংখ্যিক অনিশ্চিয়তা ও সম্ভাব্যতা দেখা দেয়।

জাতবেদা - জন্মের সাক্ষী, চৈতসত্ত্ব।

তড়িতচুম্বকীয় - প্রাকৃতিক চারটি শক্তির অন্যতম যা তীব্র ও দুর্বল শক্তির উপর কাজ করে।

তীব্রশক্তি - বস্তুর গঠন জনিত শক্তি।

দুর্বলশক্তি - বস্তুর বিক্রিয়া জনিত শক্তি।

দীর্ঘতমা - প্রথমজ ঋষি, যিনি ব্রহ্ম সাযুজ্যলাভ করেন। প্রাচীন ঋষিদের অন্যতম।

দিবঃস্তম্ভণীস্থূণা - সময় ও পরিসরের সমাবর্তনে মহাবিশ্বের আবির্ভাব। সময় যেমন গতির পরিমাপ বাহক, পরিসর তেমন বস্তুর আধার বাহক। দুটিকেই প্রত্যক্ষ করা যায়। পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের ওপর আবর্তিত হয় ২৪ ঘন্টায় একবার ও সেইসঙ্গে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ৩৬৫ দিনে একবার। সূর্য তার গ্রহ মণ্ডলকে নিয়ে ঘন্টায় ৫ লক্ষ মাইল বেগে ছায়াপথ প্রদক্ষিণ করছে ২৫ কোটি বছরে একবার। আবার এই ছায়াপথ এক মহাজাগতিক সত্ত্বার চতুর্দিকে ঘুরে আসছে। এই যে চক্রের মত পরিক্রমা তার অক্ষটি কোথায়! কোন বৃত্ত বা পরিধির মধ্যে একটি কেন্দ্র বিন্দু বা অক্ষ থাকবেই থাকবে, যাকে কেন্দ্র করে সকল কিছু আবর্তিত হয়। সেইমত মহাকাশের মধ্যভাগে একটি মহাজাগতিক সত্ত্বা থাকতেই হবে। সেই মহাজাগতিক সত্ত্বা সকল-কিছুকে বিধৃত বা আকর্ষণ করে চলছে। এই আকর্ষণী শক্তিটি যখন কোন বস্তুর ঘনত্বের উপর পড়ে

তখনই আকর্ষণী শক্তিটির প্রয়োগে অপর বস্তু আকর্ষিত হয়। এই মহাজাগতিক সত্তাটিকে প্রাচীনেরা 'দিবঃস্তম্ভণী স্থূণা' নামে আখ্যা দিয়েছেন। বেদের ভাষায় স্কম্ভ।

ধনাত্মক শক্তি - পরমাণুর কেন্দ্রীনে যে হ্যাঁ বাচক বিদ্যুৎশক্তি অবস্থান করে।

ধ্রুবাস্মৃতি - সংস্কারে পরিণত স্মৃতির রূপ।

নিউট্রন - আধানবিহীন পরমাণু।

প্রাতিভসংবিত - তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী চেতনা।

পূর্বগৃহ - প্রকাশমান জগতের পূর্বাবস্থা, আঁধারশক্তি।

পরমব্যোম - মহাশূন্যতা।

প্রশাসন - নিয়ন্ত্রণ।

প্রোটন - পরমাণুর কেন্দ্রীন।

বৃত্র - আসুরী শক্তি।

বাক্ - বাকের আবিষ্কার ভারতের মহত্তম কীর্তি। বাক্ পরমব্যোমে গুহায়িত ছিল। বাকের চারটি বিভাব। পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী। বৈখরীবাক আমাদের কথ্য ভাষা।

বৈশ্বানর - অগ্নির বিশ্বরূপ, চিদগ্নির স্ফুলিঙ্গ, সেখানে আদিত্যদ্যুটিতে দীপ্যমান, জীবচেতনা বিশ্বচেতনায় বিস্ফারিত, সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট, সর্বান্তর্যামী।

মহাশূন্য - যেখানে সময় ও পরিসর আবদ্ধ।

মহাজাগতিক - মহাকাশ সম্বধীয়।

মহাকর্ষ - ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে নিউটন মাধ্যাকর্ষণ বল আবিষ্কার করেন, আইনষ্টাইন এই বলটিকে মহাকর্ষ ক্ষেত্র আখ্যা দেন ও মহাকাশের বক্রতার দরুন এই ক্ষেত্রটির উদ্ভব বলে বর্ণনা করেন।

মূর্ধন্যচেতনা - সীমাহীন চেতনা।

বহির্দৃষ্টি - ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর সাহায্যে সত্যের অনুসন্ধান।

শিলাজিৎ - পাহাড়ের ঘাম।

সৎ - প্রকাশমান মহাবিশ্ব।
সাযুজ্য - নিত্য সম্পর্ক।
সুদাস - উত্তর ভারতের এক পরাক্রমশালী রাজা।
সময় - গতির পরিমাপ।
সুষুম্নতন্তু - মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে ঈড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী নাড়ী।
স্কম্ভ - আকর্ষণী শক্তি।
হিরণ্ময় প্রহরণ - দিব্যজ্যোতির উদ্ভাস; সকল মার্গের শেষ এই দিব্যজ্যোতির উদ্ভাসে।

গ্রন্থপঞ্জী

শ্রীঅনির্বাণ, *বেদ-মীমাংসা,* তিন খণ্ড, কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৫

——— *ঋগ্বেদ-সংহিতা: গায়ত্রী মণ্ডল,* পাঁচ খণ্ড, কলকাতা: হৈমবতী-অনির্বাণ বেদ বিদ্যালয় ট্রাস্ট, ২০০৪

ঋগ্বেদ-সংহিতা (অনুবাদ: রমেশচন্দ্র দত্ত), কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬

স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদিত), *উপনিষৎ,* কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯০

Capra, Fritjof. *The Web of Life,* London: HarperCollins, 1996

Hawking, Stephen. *A Brief History of Time,* London: Bantam Press, 1994

Max Müller, Fredrick. *The Sacred Books of the East,* Vols. 32 and 46 'Vedic Hymns', Parts I and II, Delhi: Motilal Banarsidass, 1994

Navarra, J.G. and J. Zafforni. *Today's Basic Science*, New York: Harper & Row, 1963

Penrose, Roger. *Shadows of the Mind*, Oxford : Oxford University Press, 1994

Uvarov, E. B. and D. R. Chapman. *A Dictionary of Science,* Harmondsworth: Penguin Books, 1974

Whitney, W. D. *Atharva Veda-Samhita*, Delhi: Nag Publishers, 1987

Wilson, H. H. *Rig-Veda*, Delhi: Nag Publishers, 1990